সিলেটি মৌলবাদ

সুমন তুরহান

'মৌলবাদ' সম্ভবত আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহৃত শব্দ। আদিতে এই শব্দটি বেশ নির্দোষ ছিলো, কিন্তু ভাষা ও সভ্যতার বির্বতনে এখন এটি হয়ে উঠেছে চরম নিন্দার্থক এবং ভীতিকর। এখন মৌলবাদ বলতে আমরা বুঝি–প্রতিক্রিয়াশীলতা, রক্ষণশীলতা, কূপমণ্ডুকতা, আদর্শিক উগ্রতা, চরমপন্থা, প্রগতি ও আধুনিকতা বিরোধিতা ইত্যাদি। মৌলবাদের সমার্থক শব্দে ভরে উঠেছে অভিধান। আজকের প্রেক্ষাপটে বলতে পারি, যা কিছু আধুনিকতা ও প্রগতি ও বিকাশের বিরোধী তা মৌলবাদ এবং যারা এই প্রগতিবিরোধী তন্ত্রে বিশ্বাসী তারা মৌলবাদী। দশকে দশকে আমরা অজস্র প্রজাতির মৌলবাদের উত্থান ও পতন লক্ষ্য করছি। যেমন, খ্রিস্টান ক্যাথলিক মৌলবাদ, সমাজতান্ত্রিক মৌলবাদ, নাৎসি মৌলবাদ, হিন্দু মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ প্রভৃতি। আমরা আরো শিখেছি যে, কোনো মৌলবাদই চিরস্থায়ী নয়। আজকের পরিবর্তিত বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত কট্টরপন্থার নাম 'ইসলামি মৌলবাদ'। তবে আজ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এসব আলোচিত মতবাদ নিয়ে পুনঃ আলোচনা নয়; আজ আমরা আলো ফেলে দেখতে চাই বাঙলাদেশের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মতবাদের ওপর, যার যথার্থ ব্যবচ্ছেদ ইতঃপূর্বে ঘটেনি, যার নাম আমরা দিতে পারি– 'সিলেটি মৌলবাদ'।

অন্য যে কোনো মৌলবাদের মতোই 'সিলেটি মৌলবাদ' শব্দগুচ্ছটি বেশ ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে, যা এককথায় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তবু সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগতে পারে, সিলেটি মৌলবাদ বলতে আমরা কী বুঝি? এটি এমন একটি প্রপঞ্চ যা ধর্মীয়, আঞ্চলিকতা, জাতীয়তাবোধ এমন আরো বহু চেতনার কিম্ভুত সমষ্টি; যার স্বরূপ উদঘাটন করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে একটু পেছনে, ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে হবে সিলেট এবং সিলেটিদের ইতিহাস স্বরূপ-প্রকৃতি।

একথা আমরা সবাই মোটামুটি জানি যে, সিলেটের আদি নাম ছিলো–'শ্রীহট্ট'। শ্রীহট্টের আদি বাসিন্দারা মুলত মুণ্ডা, অহমিয়া, দ্রাবিড় বংশোদ্ভুত ইন্দো-আর্য হিন্দু বাঙালি। প্রাচীন হিন্দুদের তান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থ 'শক্তি সঙ্গম তন্ত্র'–তে সিলেটকে শিলগট্ট' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল সিলেটের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত ছিলো। সিলেট বস্তুত তখন ছিলো প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। পরবর্তীতে শাহজালাল ও তার অনুচরদের প্রভাবে সিলেটের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। মুসলমান শাসনামলে সিলেটকে সরকারি দলিলপত্রে 'জালালাবাদ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বপরিব্রাজক ইবনে বতুতার রচনাবলিও একই সাক্ষ্য দেয়।

১৭৬৫ সাল থেকে বার্মাকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা সিলেটকে ভৌগলিক মর্যাদা দিতে শুরু করে। পরবর্তীতে সিলেটকে আসামের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এটি আসামের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। দেশ বিভাগের সময় রেফারেন্ডামের মাধ্যমে প্রায় পুরো সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। শুধু মাত্র করিমগঞ্জ, কাছাড় ও শিলচর মিলে করিমগঞ্জ সাবডিভিশন ভারতেই রয়ে যায়।

সিলেটের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে ভাষার কথা। মূল সিলেট ছাড়াও ভারতের গৌহাটি, শিলচর, শিলং, কাছাড়, বরাক উপত্যকা, করিমগঞ্জ, আগরতলা, লন্ডন, মধ্যপ্রাচ্য মিলে সারা বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি ৩ লক্ষ মানুষ সিলেটি উপভাষায় কথা বলেন। বাঙলার সাথে অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও এডওয়ার্ড গেইট তার 'হিস্ট্রি অব আসাম'–গ্রন্থে সিলেটি ভাষাকে পূর্ব ভারতীয় ভাষাবংশের অর্ন্তভূক্ত এবং অহমিয়া ভাষার অপভ্রংশ রূপ বলে দাবি করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানী জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনও একই মত পোষণ করেন। তবে, সমসাময়িক ভাষাবিদ রেইমন্ড গর্ডন সিলেটি উপভাষার সাথে বাংলার ৭০ শতাংশ মিল রয়েছে বলে মনে করেন। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের 'কাইথি' লিপির অনুকরণে সিলেটি ভাষা এককালে 'নাগরি' লিপিতে লিখিত হতো, তবে এসব লিপি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালের ধুলোয়। বিপুল পরিমাণে হিন্দি, আরবি ও ফারসি শব্দের উপস্থিতি সিলেটি উপভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সিলেট বাঙলাদেশের অন্যতম প্রাচুর্যশালী অঞ্চল। বাঙলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রবাসীর সংখ্যা সিলেট অঞ্চলে এবং অসংখ্য পরিবার প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভর করে থাকেন। সিলেটি প্রবাসীদের অপচয়প্রবণতা সর্বজনবিদিত; তারা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেন কিন্তু শিল্পকারখানা তৈরিতে কখনো খরচ করেন না, শিল্পায়নের চাইতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে তাঁরা সাধারণত বেশি উদ্যোগী। সিলেটিরা ভ্রমণপিপাসু নন, সিলেটের বাইরে একমাত্র লন্ডন সম্পর্কেই তাঁরা খোঁজখবর রাখেন আর বাঙলাদেশ সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান শোচনীয়ভাবে সীমিত। একবার সারা বাঙলাদেশ ভ্রমণে গিয়ে আমি আবিস্কার করেছিলাম দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সিলেটিরা বেশ অলস। উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যেভাবে প্রতি ইঞ্চি জায়গা কাজে লাগিয়ে সারা বছরব্যাপী কৃষিকাজ করেন সিলেটে তা বিরল, এখানে একরের পর একর জমি আবাদহীন পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই অলস সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব

দেখতে পাই সিলেটের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে, লন্ডন যাওয়া ছাড়া আত্মনির্ভর হওয়ার আর কোনো পথ তাদের জানা নেই। সিলেটের শিরায় শিরায় সবসময় প্রবাহিত হচ্ছে লন্ডন আর মধ্যপ্রাচ্যের মুদ্রা, ওই দু-টি অঞ্চলের আর্শীবাদ ছাড়া সে অচল।

সিলেটের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সিলেটিরা বেশ সচেতন ও স্পর্শকাতর। স্বাজাত্যবোধ এ অঞ্চলের মানুষের মাঝে জন্ম দিয়েছে এক কট্টর আঞ্চলিক মৌলবাদের, যার প্রমাণ পাই নন-সিলেটিদের প্রতি সিলেটিদের বৈষম্যমূলক আচরণে। বাঙলাদেশের বাসিন্দা হয়েও সিলেটিরা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষকে নির্বিচারে 'নোয়াখালি' বলে গালমন্দ করেন। সিলেটিদের কাছে নন-সিলেটি মাত্রই 'নোয়াখালি'! কেউ হয়তো বগুড়ার বাসিন্দা, কেউ পাবনা-রংপুর-খুলনার; কিন্তু সিলেটিদের কাছে নিজেরা ছাড়া বাকি ৬০টি জেলার সবাই 'নোয়াখালি'। এই আচরণ সিলেটিদের মূর্খতার প্রচণ্ড প্রকাশ। আঞ্চলিক মৌলবাদের ভয়াবহতম রূপটি ধরা পড়ে সিলেটি ভাষাতেও। সিলেটিরা অবলীলায় নিজেদের 'সিলেটি' এবং অন্যদের 'বেঙ্গলি'বলে আজো অভিহিত করেন, যদিও জাতিত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের উপজাতি সম্প্রদায় ছাড়া বাকি প্রত্যেকেই 'বেঙ্গলি' বা বাঙালি। তবে উন্নাসিক সিলেটিরা এসব যুক্তি বুঝতে রাজি নন, তাঁরা নিজেদের ছাড়া বাকি সবাইকে নিম্নশ্রেণীজাত বলেই মনে করেন। কুয়োর ব্যাঙ আর কাকে বলে! সিলেটি অঞ্চলে যে সকল নন-সিলেটিরা কাজের উদ্দেশ্যে বা বেড়াতে আসেন তাঁদের অধিকাংশই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যান। স্থানীয়রা অনেক সময় তাঁদের সাথে চলিত বাঙলায় কথা না বলে সিলেটিতেই কথা চালিয়ে যান। আরেকটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য হচ্ছে যে–এসব কর্মজীবীদের সন্তানেরা সিলেটের স্কুল-কলেজে সিলেটি সহপাঠীদের মৌখিক নির্যাতনের স্বীকার হয়। 'পারলে আমাদের মতো কথা বলো, নইলে কথা বলতে এসো না', 'তুই তো একটা নোয়াখালি'–ইত্যাদি। এটা বলা অন্যায় হবে যে সব সিলেটিরা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন, তবে অধিকাংশরাই সচেতন বা অসচেতনভাবে এমনটি করে থাকেন।

সিলেটি মৌলবাদের অন্যতম শিকার হচ্ছেন উত্তরবঙ্গের রিকশাচালকেরা, যাঁরা পেটের দায়ে এ অঞ্চলে রিকশা চালাতে আসেন। এদের মধ্যে অনেকেই খণ্ডকালীন রিকশাচালক, নিজের দেশে হয়তো অনেকেরই জমিজমা ও ফসল রয়েছে। সিলেটে এসে তাঁরা প্রথমেই মুখোমুখি হন ভাষিক এবং আঞ্চলিক নির্যাতনের। আমি নিজেও বহুবার মৌলভীবাজারের রাস্তায় রিকশাচালকদের নির্যাতনের শিকার হতে দেখেছি। আরোহী হয়তো তাঁকে যেতে বলেছেন একদিকে, তিনি গিয়েছেন আরেকদিকে,–সিলেটি ভাষা বুঝতে পারেননি বলে। রংপুরের তারাগঞ্জে তাঁর গায়ে কেউ হাত তুললে তিনি হয়তো অপরাজেয় নূরলদীনের মতো 'জাগো বাহে' বলে প্রতিবাদটুকু অন্তত করতে পারতেন; তবে সিলেটে তিনি তা করবেন না, এখানে তাঁর কথা-বলারও অধিকার নেই।

নাট্যকার শাকুর মজিদের 'লন্ডনি কইন্যা' নাটকটি নিয়ে সিলেটবাসীরা রীতিমতো গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। এই উন্মাদনার কারণটি আমার কাছে আজো অস্পষ্ট। এই সত্যটি অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, অধিকাংশ সিলেটি তরুণেরা 'লন্ডনি চেতনা' নিয়ে বেড়ে ওঠে, লন্ডনই তাদের প্রথম প্রেম এবং লন্ডন যাওয়াই তাদের জীবনের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে খালাকে মা ডেকে, ভাবীকে বৌ ডেকে লন্ডন যাওয়ার উদাহরণও বিরল নয়; অন্তত ব্রিটিশ হাইকমিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট সে কথাই বলে। তবে লন্ডন যাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থাটি হচ্ছে 'লন্ডনি কইন্যা' বিয়ে করা; স্থানীয়ভাবে যার আরেক নাম হচ্ছে 'পেটিকোট ভিসা'। অধিকাংশ সিলেটি অভিভাবকই নিজেকে ধন্য মনে করেন যদি তাঁদের এস.এস.সি ফেল সুপুত্রটি অথবা কলেজের সুদর্শন গুন্ডাটি কোনো 'লন্ডনি কইন্যা' বিয়ে করে লন্ডন যেতে পারে। এই অপ্রিয় সত্যগুলো সবাই জানেন, এমনকি যাঁরা শাকুর মজিদকে সিলেটে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদেরও অজানা থাকার কোনো কারণ নেই। দুঃখজনক হলো, এই সত্যগুলো জেনেও সিলেটিরা চমৎকার ভন্ডামো করেন। তাঁরা কিছুতেই আত্মসমালোচনা করতে রাজি নন, নিজেদের ভাবমূর্তির ব্যাপারে তাঁরা খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন নিরন্তর। কী শোকাবহ এই স্ববিরোধিতা! সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্র কি জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়? যদি তাই-ই হয়ে থাকে তাহলে সত্য প্রকাশে বাধাটা কোথায়? লন্ডনপ্রেম খারাপ কিছু নয়, লন্ডন খুবই চমৎকার নগরী, লন্ডন যাওয়াতেও আমি আপত্তির কিছু দেখি না। লন্ডন প্রবাসীদের কল্যাণে সিলেট অনেক আর্থ সুবিধা উপভোগ করে আসছে। তবে সময় এসেছে, লন্ডনপ্রেমের নেতিবাচক দিকগুলো বিচার করে দেখার। আমরা কি পেরেছি বাঙলাদেশকে একটি আধুনিক, পরিশীলিত ও শিক্ষিত প্রজন্ম উপহার দিতে যা নিয়ে সিলেটবাসী গর্ব করতে পারেন? তুলনামূলক বিচারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আমরা পিছিয়ে আছি শিক্ষাক্ষেত্রে। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি প্রতিটি সৃষ্টিশীল এলাকাতেই আমাদের অবস্থান শোচনীয়। এখানে শিল্পকারখানার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া কঠিন। লন্ডনপ্রেমের হুজুগ সিলেটকে যতোটা কলঙ্কিত করেছে, অন্য আর কিছু ততোটা করেনি। আমাদের তরুণদের লন্ডনমোহের অবসান ঘটা জরুরি, অভিভাবকদের মোহমুক্তি ঘটা আরো বেশি জরুরি।

আমাদের সিলেট বাঙলাদেশের সবচেয়ে রক্ষণশীল এলাকা বলা যায়। প্রগতির কথা বলা এখানে অত্যন্ত বিপদজনক। এখানে কবি শামসুর রাহমান নিষিদ্ধ, 'লাল সালু' নাটক নিষিদ্ধ, সম্প্রতি ডক্টর জাফর ইকবালও নিষিদ্ধ হয়ে গেছেন।

সিলেট নিয়ে কিছু বলা বা করাই মুশকিল। হেলাল খান পরিচালিত 'হাছন রাজা' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর সিলেটে ব্যাপক তোলপাড় হয়, পরিচালকের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করা হয়েছিলো। লন্ডনপ্রবাসী সিলেটিরাও রক্ষণশীলতায় পিছিয়ে নেই, সেখানেও পাই সিলেটি মৌলবাদের প্রবল রূপ। সম্প্রতি, বাঙালি বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ লেখিকা মনিকা আলি তাঁর বহুলবিক্রিত 'ব্রিকলেন' উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়নের ঘোষণা দিলে সিলেটিরা প্রচন্ড খেপে ওঠেন, অশান্ত হয়ে উঠে কার্ডফ-ব্রিকলেন-টাওয়ার হ্যামলেট। মনিকা আলির মা ইংরেজ, বাবা নন-সিলেটি বাঙালি-এটাই কি অশান্তির কারণ? মত প্রকাশের স্বাধীনতা এখন বিপন্ন পাশ্চাত্যেও, আর তা আমাদের হাতেই।

তবে শুধু নন-সিলেটিরাই নন, সিলেটি মৌলবাদের শিকার কখনো কখনো সাধারণ সিলেটিরাও। এ অঞ্চলে বসবাসকারী 'সৈয়দ' বংশীয়দের কৌলিন্য ও জাত্যভিমান বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ইসলামে জাত্যভিমান সাধারণত নিরুৎসাহিত করা হলেও, আদিম সৈয়দদের মধ্যে তা অত্যন্ত প্রকট; তাঁরা তৃপ্তি পান সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করে। বাঙলার পলিমাটিতে জন্ম নিয়েও সৈয়দরা নিজেদের আরব-ইরান-তুরস্কের বংশধর বলে দাবি করেন, ভোগেন প্রান্তিক মানসিকতায়। এটি একটি অচিকিৎস্য মানসিক রোগ। অনেক 'শিক্ষিত' সৈয়দরাও নিজেদের গোত্র ছাড়া অন্য কোনো গোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক মেনে নেন না। এতে অবশ্য তাঁদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়, সিলেট অঞ্চলে সৈয়দ-অধ্যুষিত গ্রামের অভাব নেই। আমার শহর মৌলভীবাজারে একটি গ্রাম আছে, যেখানে অবিশ্বাস্য হলেও প্রতিটি পরিবারই নিজেদের সৈয়দ পরিবার বলে দাবি করেন। এই দাবির ওপর অবশ্য কোনো কথা নেই! সিলেটি মৌলবাদের সবচেয়ে করুণ, হাস্যকর, ভয়াবহ রূপ দেখতে পাই আরেকটি ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারা নির্দ্বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি থাকেন, কিন্তু সিলেটিরা এর পুরোপুরি বিপরীত। দেশের অন্য কোথাও বিয়ের কথা উঠলে আজো সিলেটিদের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। এই অদ্ভুত মানসিকতা সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের জন্য চমৎকার গবেষণার বিষয় বলে গণ্য হতে পারে। সিলেটিরা কোনোভাবেই তাঁদের বিশুদ্ধ অমলিন রক্তকে মলিন করতে চান না, যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে এই বিশুদ্ধতা। এই কপট ভন্ডামোর কোনো ভিত্তি নেই, এটিও একটি অসুস্থ মানসিকতা। এ জাতীয় কট্টর রক্ষণশীলতা কখনো কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না, বরং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মীয়তার প্রচলন হলে সিলেটিদের গোঁড়ামি অনেকটা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।

আমাদের জন্মস্থান সিলেটে একটি সামাজিক পরিবর্তন খুব দরকার এই মুহূর্তে আর তা আসতে হবে প্রগতিশীল সিলেটিদের মধ্য থেকে, আমাদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যেই। ঐশ্বর্যের অভাব দেখতে পাই না সিলেটে, কিন্তু সুশিক্ষা ও মেধার অভাব খুবই প্রকট। 'মেধা প্রকল্প', 'নির্ঝর'–জাতীয় সংগঠনগুলো একসময় বেশ সাড়া জাগিয়েছিলো, এখনো কোনো কোনোটি ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে, ওভাবে টিকে থাকা মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করছে অত্যন্ত হতাশাজনক পরিস্থিতি–যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই চরম বন্ধ্যাত্ব। শ্রেণীকক্ষে স্থানীয় শিক্ষকেরা চমৎকার কমলালেবুর গন্ধযুক্ত সিলেটি বলেন; ভুলে যান বহিরাগত ছাত্রদের কথা, আর আঞ্চলিক রাজনীতি মারপ্যাঁচ কষে কোণঠাসা করে রাখেন নন-সিলেটি শিক্ষকদের। এই প্রবণতা স্থানীয় ছাত্রদের পরিশীলিত বাঙলা শেখার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। উচ্চারণে অশুদ্ধতা ও প্রবল সিলেটি প্রভাবের ফলে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি-বিতর্ক থেকে শুরু করে আরো নানা ক্ষেত্রে আমাদের অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে ব্যর্থ হয়; বিপুল উৎসাহ নিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় যায় এবং সাধারণত অশ্বডিম্ব নিয়ে ফিরে আসে। শুধু শিক্ষক বা অভিভাবক নন, আমাদের অর্থমন্ত্রীকেও মাঝেমধ্যেই দেখি টিভিতে অবলীলায় সিলেটিতে কথা বলছেন, সিলেটিতে সাংবাদিক সম্মেলন করছেন, সিলেটিতেই করছেন বাজেট পেশ। এমনকি দাতা সংস্থাগুলোর সঙ্গে বৈঠকেও তিনি সিলেটি সুরেই ইংরেজি বলেন। তাঁর কল্যাণে আজ বাঙলাদেশের এমন অনেকেই সিলেটি শিখে বসে আছেন, যাঁদের কখনো শেখার প্রয়োজন ছিলোনা। সমভাষী বন্ধুদের সাথে আড্ডায় বা ঘরোয়া পরিবেশে নিজস্ব উপভাষায় কথা বলাটা অবশ্যই কোনো অপরাধ নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু শ্রেণীকক্ষে, মঞ্চে, সংসদে, সাংবাদিক সম্মেলনে পরিশীলিত বাঙলা বলতে না চাওয়া, লিখতে না পারাটা কি অপরাধ বলেই গণ্য করা উচিত নয়?

সিলেট, মহাসমুদ্রের একটি ক্ষুদ্রতম চর, আর আমরা সেই চরের অধিপতিরা, আর কিছু করতে না পারলেও জন্ম দিয়েছি একটি স্বতন্ত্র মৌলবাদের। সিলেটি মৌলবাদ, অত্যন্ত নীরবে, বহুদিন ধরেই ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ মহামারি আকারে, এখনই এই প্রগতিবিরোধী আঞ্চলিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে রেখে কোনো ইতিবাচক অর্জন আনা সম্ভব নয়। কোনো মুক্তমনের মানুষই আঞ্চলিক মৌলবাদে দীক্ষিত হতে পারে না; পারেন না সংকীর্ণতার দেয়ালে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে। পৃথিবীটা অনেক বড়ো, তবে আমাদের সুশীল ভণ্ডরা এখনো বেশ আদিম, তাঁদের সময় এসেছে কুয়োর বাইরে বেরিয়ে এসে বিশাল বিশ্বটাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার। আমরা প্রত্যেকে মানুষ, এবং আমরা প্রত্যেকেই বাঙলাদেশের বাঙালি–এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে সিলেটবাসীর আর কতোকাল লাগবে?

তথ্যসূত্র

১. মতিউর রহমান চৌধুরী, সিলেট ও সিলেটি ভাষা, মার্চ ১৯৯৯। স্টার প্রকাশনী।

Edward Gate, History of Assam, p274, spink & Co.

George Abraham Grierson, Language survey of India, 2nd Vol, Part 1, Page 224, Royal Asiatic Society.

2. Sanjib Barua, India against itself; Assam and the politics of nationality, p42. University of Pensilvenia Press.

3. Monika Ali, Briclane, Black Swan 2004

Indian Council for cultural relations: The Indo-Asian Culture. p29;

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল- এর কাছে খোলা চিঠি

ফাতেমা রেজমিন

শ্রদ্ধেয় জাফর স্যার,
অনেক দিন ধরেই ইচ্ছে ছিলো আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে কিংবা আপনার সাথে সরাসরি দেখা করে, কয়েকটি কথা বলবো। দুটোই আমার জন্য তেমন কঠিন ছিল না, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক নানা অস্থিতিশীল অবস্থা এবং তা নিয়ে আপনার ব্যস্ততা-মূলত এই দুয়ের কথা ভেবেই আজকে *যুক্তি*র মাধ্যমে আমার এই খোলা চিঠির অবতারণা। স্যার, কিছুদিন আগে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ওপর অসাধারণ একটি বই পড়ার। সৌভাগ্য বলছি এ কারণেই যে, বর্তমান সময়ে বইটি হয়তো আর সহজলভ্য নয়; বইটি হলো, "একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়" (মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, পঞ্চম মূদ্রণ : ১৯৯২ সাল) আজকে আমার খোলা চিঠিটি এই বইটিকে কেন্দ্র করে।

আমার বিশ্বাস, বইটি আপনি পড়েছেন অথবা বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ অবগত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কুৎসিত-কলংকিত ঘাতক, দালাল, রাজাকার-আলবদরদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে আমার একটু একটু ধারণা থাকলেও বিশদভাবে এদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। তাই যখন এই অসাধারণ বইটি হাতে নিলাম আমি এক নিঃশেষে পড়তে পারিনি। ধীরে ধীরে বইটি পড়ার সময় আমার কখনো ঘৃণায় মুখ কুঁচকে গেছে, কখনো সারা শরীর শিউরে উঠেছে, তীব্র যন্ত্রণায় কখনো কেঁপে উঠেছি, আবার কখনোবা নিষ্ফল আক্রোশে প্রচণ্ড কষ্ট মনে চেপে, বই বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙলা ভাষা টিকিয়ে রাখার জন্য পরিচালিত মহান মুক্তিযুদ্ধকে যে সকল ঘৃণা চক্রান্তকারী রাজাকার-আলবদর-দালালের দল ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল, এদেশের গণমানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলামের নাম নিয়ে কৌশলে লাম্পট্য-ভণ্ডামি করে 'পাকিস্তান' নামক হিজড়ে রাষ্ট্র টিকিয়ে রেখে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল, এদেশের লাখো নারীকে ভোগের সামগ্রী বানিয়েছিল, এদের পরিচয় জেনে আমি চোখে পানি ধরে রাখতে পারিনি, ঘৃণায় সারা শরীর রি রি করেছে। এরা কী করে এতো জঘণ্য কাজ করতে পারলো? বিবেক, মনুষ্যত্ব কি এদের বিন্দু পরিমাণও ছিল না?

আজকের এই নির্বাচনী ডামাঢোলের সময় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক দাবিদার কতিপয় রাজনৈতিক দলগুলো এই সকল কুখ্যাত খুনী সাথে কী করে আপোসের কথা বলে, একত্রে বাংলাদেশের একমঞ্চে দাঁড়িয়ে সরকার গঠনের প্রত্যয় নিয়ে রাজনৈতিক স্লোগান দেয়, শহিদ মিনারে-স্মৃতিসৌধতে গিয়ে ফুল দেয়? ছি! ছি! আজকে আলবদরের দল শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করে, এর থেকে নোংরা তামাশা এই বাংলাদেশে কি আর কখনো হয়েছে? এখনো তো এদেশ থেকে সকল মুক্তিযোদ্ধারা মারা যাননি, একাত্তরের শহিদের রক্তের দাগ এখনও রাজাকারের হাত থেকে মুছে যায়নি, মাটিতে এখনও মুক্তিযোদ্ধাদের লাশের গন্ধ, বাতাসে ভাসে একাত্তরে সন্তানহারা মায়ের করুণ ক্রন্দন, বিচার না-পাওয়া ধর্ষিত নারীর আর্তনাদ। কতশত মা আজো মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের কবর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, একটি বার দেখবেন শুধু। তবে, কেমন করে ওরা আজ বাংলাদেশকে *বাংলাস্থান* বানিয়ে দিতে চায়? রাজপথে জঙ্গি হুঙ্কার দেয় 'বাংলা হবে আফগান, আমরা হবো তালেবান'। আমার ধারণা, আমাদের মতো মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মের প্রায় সবারই এই সব ঘৃণ্য অপরাধী সম্পর্কে এবং তাদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই। যার জন্যে, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে এই সকল যুদ্ধাপরাধীদের রাজনৈতিক-সামাজিক শক্ত অবস্থান তৈরি-হওয়ার পেছনে আমাদের এই অজ্ঞানতাও অনেকটা দায়ী। তাই আপনার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, অতীতে আপনি যেভাবে পত্রিকার পাতায় আপনার কলামে বর্তমান প্রজন্মের পাঠের জন্য মুক্তিযুদ্ধের ওপর কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই এই বইটি পড়ার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন। কারণ, শুধুমাত্র আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবগাথা জানলেই চলবে না মুক্তিযুদ্ধের কলংকিত-ঘৃণ্য দালাল, রাজাকারদের কথাও আমাদের জানতে হবে, তাদের কে চিনতে হবে, তাদেরকে সামাজিকভাবে-রাজনৈতিকভাবে বয়কট করতে হবে; তাহলেই আমরা আমাদের শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের ঋণ কিছুটা শোধ করতে পারব। যদিও বলা হয়ে থাকে, পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। কিন্তু এই সকল রাজাকার, যুদ্ধাপরাধীদেরকে ঘৃণা করা, তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো আমাদের দায়িত্ব। আমার মতো এ দেশের বহু কিশোর-তরুণের আদর্শ আপনি, তাই আপনি যদি তাদেরকে "একাত্তরের ঘাতক ও দালারো কে কোথায়" বইটি পড়তে বলেন, তবে আমি মনে করি, তারা অবশ্যই আপনার কথা গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করবে। এবং অবশ্যই '*একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায়*' ধরনের গ্রন্থ আরো বেশি করে প্রকাশ করতে হবে।

এখন একাত্তরের ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের বিচার নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, সেই প্রশ্নগুলোই উত্থাপন করবো :

- ১৯৯২ সালের দিকে শহিদ জননী জাহানারা ইমাম ঘৃণ্য রাজাকার-আলবদরদের বিচারের জন্য যে গণআদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আপনারা যারা তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন, তাঁরা কি সেই গণআদালতের রায় বাস্তবায়ন করার জন্য আবার এই আন্দোলন শুরু করতে পারেন না?
- মুক্তিযুদ্ধ চেতনাবিকাশ কেন্দ্র, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত সংগঠনগুলোতে কি আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনা একেবারেই অসম্ভব?
- গণআদালত বা আমাদের প্রচলিত আদালতের মাধ্যমে একাত্তরের এই সকল চিহ্নিত দালালদের বিচার কি কেনোদিনই হবে না? আমাদের বাঙালি সমাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার জন্য অতীব প্রয়োজনীয় হচ্ছে, রাজাকার- আলবদরদের যুদ্ধাপরাধীর তালিকা তৈরি করা-এদের বিস্মৃত হওয়ার আগেই তৈরি করতে হবে। এই ধরনের উদ্যোগ কবে নেয়া হবে?
- একাত্তরের ঘৃণ্য অপরাধীদের ভোটাধিকার, রাজনীতি করার অধিকার কি কেড়ে নেয়ার আন্দোলন কি আর কোনদিনই সম্ভব হবে না? তারা কি কখনোই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে না?
- যে সাহসিকতা নিয়ে আপনারা বিগত সরকারের ‘একমুখী শিক্ষানীতি’ নামে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, একই রকম সাহস নিয়ে কি আবারও একাত্তরের ঘাতকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা যায় না?

জানি, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের আন্দোলনের পথ অনেক দুর্গম, এমনটি এই ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে চিন্তা করাও বৃথা, কারণ একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে চাইলে সরকার, এবং সরকারি প্রশাসন থেকে বিন্দুমাত্র কোনো সহযোগিতা পাওয়া যাবে না এবং আমাদের নব্যরাজাকারেরা পেশিশক্তি দিয়ে এই আন্দোলন স্তব্ধ করতে চাইবে। কিন্তু তারপরও আমার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে, একদিন বাংলাদেশের হাজারো বধ্যভূমিতে আমার চিৎকার করে বলব, আমরা অকৃতজ্ঞ নই ...... আমরা ওদের সাথে আপোস করিনি ...... আমরা রাজাকারদের ক্ষমা করিনি, আমারা ওদের বিচার না করে ক্ষমা করব না .... করতে পারি না।

আমার এই লেখা যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আশা করি আপনি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবেন। আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি। সবশেষে, আবারো আমি ওই সকল ঘৃণ্য রাজাকার-আলবদর-আলশাম্‌সদের উদ্দেশ্য বলি-

... আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ
দিয়েছিলো সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,
.... আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের।

-- অভিশাপ দিচ্ছি / শামসুর রাহমান।

মুসলিম দর্শনে মুতাজিলাবাদ

মনির হোসাইন

দর্শন :

সুদীর্ঘকাল ধরেই মানুষের চিন্তাজগতে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণতি সংক্রান্ত কিছু কিছু মৌলিক বিষয়াবলি নিয়ে নানা বিস্ময়, কৌতুহল, জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিস্ময়বোধ, কৌতুহল–জিজ্ঞাসার তাগিদেই মানুষ নামক প্রজাতি চালিত হয়ে আসছে অজানাকে জানার, বিশ্ব-মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের, মানবজীবনের বিবিধ রহস্য উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে। ছোট্ট একটি পাখি যেমন ডানা মেলে উড়ে যায় দূর থেকে অনেক দূরে, আকাশের মেঘ যেমন পাড়ি দেয় লোক থেকে লোকান্তরে, তেমনি যুগে যুগে কৌতুহলী মানুষ তার শত সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে ব্রতী হয়ে জ্ঞানানুশীলন আর সত্যানুসন্ধানের দুঃসাহসিক কাজে। এই জ্ঞানানুশীলন আর সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা মানবসত্ত্বার এক অলঙ্ঘনীয় আবেদন এবং এই আবেদনে সাড়া দিয়েই যুগে যুগে চার্বাক, কপিল, বৌদ্ধ, যাজ্ঞবাল্ক্য, শঙ্কর, এপিকিউরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, আল্লাফ আবুল হুজায়ল আল-আল্লাফ, নজ্জাম, জাহিজ, মুআম্মর, আবু হাসিম, হেগেল, স্পিনোজো, কান্ট, টমাস হাক্সলি, কার্ল মার্কস, রাসেল, আরজ আলী মাতুব্বর প্রমুখ ভাবুক-চিন্তাবিদ-দার্শনিক নির্মাণ করেছেন দর্শনের আঁকাবাঁকা ইতিহাস; এবং এই ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় রচিত হয়েছে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য।

আমাদের মানবসভ্যতার মতোই দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু এর কোন সরল সোজা সংজ্ঞা নেই। তবে স্বরূপ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্ণয় সরাসরি সম্ভব না হলেও দর্শনের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিতজনেরা মোটামুটি একমত। ইংরেজি 'Philosophy' এবং `Philosopher' শব্দ দু'টি গ্রিক শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক শব্দ `Philos' এর অর্থ হলো অনুরাগ (Loving) এবং `Sophia' শব্দটির অর্থ হলো জ্ঞান (Knowledge)। সুতরাং 'Philosophy' শব্দের ধাতুগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা সত্যের প্রতি অনুরাগ। কাজেই `Philosopher' বলতে আমরা বুঝি সেই ব্যক্তিকে যিনি জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী বা সত্যের প্রতি অনুরাগী। পাশ্চাত্য দেশে যাকে 'Philosophy' বলা হয়, তাকেই আমরা 'দর্শন' নামে অভিহিত করি। 'দর্শন' শব্দটির উৎপত্তি 'দৃশ' ধাতু থেকে। দৃশ মানে দেখা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'দর্শন' বলতে 'কোন কিছুকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করাকে বুঝায়। এজন্যই Oxford Dictionary- তে 'Philosophy' শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছে এভাবে "Use of reason and argument in seeking truth and knowledge of reality, esp. knowledge of the causes and nature of the things and of the principles governing existence" দর্শনের এরূপ সজ্ঞা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দর্শন হচ্ছে–'যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কোনো বিষয় সম্পর্কে মুক্তচিন্তার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ।' তাহলে বোঝা যায় যে, কোন ধরনের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস সংশয়হীন মনোভাব থেকে চিরাচরিত প্রথার প্রতি অন্ধ-আনুগত্যশীল জ্ঞান কখনো দর্শন হতে পারেনা। কিন্তু তারপরও নানা সময়ে নানা পবিত্র (!) কেতাব দ্বারা আশ্রিত বক্তব্য নানা জ্ঞানীগুণীর কাছে দর্শন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। সেগুলো আসলেই কি কোন দর্শন, এটি প্রশ্নসাপেক্ষ। এর উত্তরে বলতে হয়, মানুষের চিন্তা, চেতনা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, শ্রম ইত্যাদি মানব ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দর্শন বিকাশে মুখ্যভূমিকা পালন করে থাকে।

মুসলিম দর্শন ও ইসলামি দর্শন :

'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি আরবি 'সালম' ধাতু থেকে। সালম মানে শান্তি, উৎসর্গ, আত্মসমর্পণ। এ আত্মসমর্পণ জগতের স্রষ্টা নিয়ন্তা মহান আল্লাহর ইচ্ছা, আদর্শের কাছে; কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নয়। ইসলামি মতে, পরম স্রষ্টা আল্লাহর কাছে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এবং সমগ্র সৃষ্টির ব্যাপক কল্যাণের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা প্রতিটি মুসলমানেরই লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। ইসলাম অনুসারে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব এবং মানবজীবন যা কিছু আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এসব আদর্শ অনুসারে এবং এগুলো রূপায়নের প্রচেষ্টার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছেন পবিত্র কোরআন শরিফ। এছাড়া আমাদের জন্য রয়েছে মহানবি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনাচরণ (হাদিস)। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা (Complete Code of Life)।

তাহলে ইসলামি দর্শন বলতে আমরা বুঝি, পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সকল দার্শনিক ধারণাবলি। যে কোনো মুসলমানের চিন্তা-ধ্যান-ধারণা দৃষ্টিভঙ্গি নয়। আবার 'মুসলিম দর্শন' কথাটির অর্থ একটু ব্যাপক। এটি এদিকে যেমন পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বিস্তৃত দর্শনকে বোঝায়, তেমনি আবার ইসলামি চিন্তার বিকাশে নানা পর্বের নানা সম্প্রদায় ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও চেতনাকে নির্দেশ করে। যেমন মুতাজিলাবাদ।

মুতাজিলাবাদ :

হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম ও রাজ্যসীমা আরবের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে এবং পরবর্তী দুশতাব্দীর মধ্যে মিশর, সিরিয়া, ইরাক (বাগদাদ), উত্তর আফ্রিকা, মরক্কো এবং স্পেন ইসলামি রাজ্যের আওতাভূক্ত হয়। এসব নতুন অনারব রাজ্যের অমুসলিম (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে তারাও 'কেতাবিমানুষ' হিসেবে পরিচিত হয়। বিজিত রাজ্যের মধ্যে মিশর ও সিরিয়া এই দুটি রাজ্যই ছিল গ্রিক-অধ্যুষিত এবং গ্রিক দর্শন প্রভাবান্বিত। যার ফলে আরবরা গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের বই অনুবাদ শুরু করেন। মূলত গ্রিক দর্শনের বইগুলো অনুবাদ শুরু করেন পারস্যদেশীয় দার্শনিক ইবনে মোকাফা। ড. রিচার্ড ওয়াল জেবের এর মতে, 'আরব দার্শনিকরা সেইসব গ্রিক দার্শনিকের রচনা অনুবাদ করে গেছেন–যাঁরা গ্রিক স্কুলগুলোর শেষ দিকের দার্শনিক ছিলেন।"

এভাবেই একের পর এক প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, প্রতীচ্যের রাজ্য জয়ের ফলে বিশ্বদর্শনের ধারা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারে গ্রিকদর্শন, আরব-দার্শনিকদের যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। তাঁদের মাঝে প্রাচ্যের খ্রিস্টান মতবাদ, পারস্যের জোরোস্টারের মতবাদ–শিক্ষা, গ্রিক দর্শন এবং নব্যপ্লাটোনিক মতবাদের অংশ দিয়ে পুষ্ট। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী–'আল্লাহতায়ালা প্রথমেই যুক্তি ও মতবাদের জন্ম দিয়েছেন।' কিন্তু এই 'যুক্তি ও মতবাদ তথা মুক্তিকে' নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ দেখা দেয়। তৎকালীন যুক্তি ও মুক্তচিন্তার বিপক্ষে প্রায় সবাই অবস্থান নেয়। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। যাঁরা তৎকালীন সময়ে এই 'যুক্তি ও মুক্তির' মাঝে জগৎ-সংসার, ধর্ম-সমাজ, মূল্যবোধ তথা গোটা জীবনটাকেই ভেবেছেন, দেখেছেন পরবর্তী সময়ে তারাই ইসলামি দর্শন জগতে দার্শনিক হিসেবে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা মুক্ত চিন্তক যুক্তিবাদী প্রগতিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। যারা পরবর্তীতে 'মুতাজিলা' হিসেবে আবির্ভূত হোন।

'মুতাজিলা' আরবি 'ইতিজাল' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। মওলানা মাসউদি বলেন–'যারা ইতিজালের মতবাদ মেনে চলে তারাই মুতাজিলা'। 'মানজিলাতুন বাইনালমান জিলাতায়ন' অর্থাৎ যারা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী এক তৃতীয় অবস্থার নীতি স্বীকার করে, তাঁরাই মুতাজিলা। 'মুতাজিলা' ধারণার উৎপত্তি কিন্তু ওয়াসিল আতার (হিজরি দ্বিতীয় শতকে) সময়ে হয়নি; এর উৎপত্তি শিয়া এবং খারিজি আন্দোলনের অনুরূপ পরিবেশে ও অবস্থায় উদ্ভব হয়েছিল বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক প্রমাণিত সত্য যে, আলীর খিলাফত লাভের পর যাঁরা তাঁর আনুগত্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মত হন এবং অস্বীকার করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন–তালহা, যুবাইর, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মুহাম্মদ ইবনে মাসালামা, ইসামা ইবনে যায়েদ, সুহাব ইবনে সিনান ও খালেদ ইবনে সাবিত (তাবারী)। এঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন তালহা আর যুবাইর। আর অধিকাংশ নিরপেক্ষ রয়ে যান। বসরাতে আহনাফ ইবনে কায়েস ও সাবরা ইবনে শায়মান এই কোন্দল থেকে দূরে সরে থাকেন। এঁদের দূরে সরে থাকার প্রসঙ্গে 'ইতাজালা' শব্দটি ক্রিয়া পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আলী ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিবাদে নিরপেক্ষ থাকার অর্থে 'ইতাজিলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মূলত 'ইতাজালা' রাজনৈতিক শব্দ। আলী খলিফা হলে একটা দল সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, মোহাম্মদ ইবনে মাসালামা ও উসামা ইবনে জায়েদের নীতি অনুসরণ করে আলীকে খলিফা স্বীকার করলেও তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে যাকে (ইতাজালু) এবং খলিফার পক্ষে ও বিপক্ষে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে।

সম্ভবত এদেরকেই 'মুতাজিলা' বলা হতো এবং তারাই পরবর্তী সময়ে মুতাজিলার পূর্বসূরি। পরে রাজনৈতিক মুতাজিলা থেকে ধর্মতাত্তিক মুতাজিলার উদ্ভব হয়। এটা দিবালোকের মত সত্য যে, ইতিজাল শব্দ থেকে মুতাজিলা শব্দের উদ্ভব হয়। ওয়াসিল আতা প্রথমে এ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পরে আমর ইবনে বাহার আল জাহিজকে তাঁর শিক্ষার অনুসারী করেন।

'মুতাজিলাবাদ' মূলত ইসলামের শিয়া সম্প্রদায়রা পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। ওয়াসিল বিন আতা ও আমর বিন ওবায়েদ এ দুজন ছিলেন মুতাজিলাবাদের প্রবক্তা। এতে অবশ্য কেউ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন–তারা বলেন, শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর আস-সাদিকের শিষ্য ও ওয়াসিল ইবনে আতা (মৃত্যু ১৩১ হি:) এই সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেন।

'মুতাজিলাবাদের' প্রবক্তা কে বা কারা, এই নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও এ বিষয়ে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, এঁরা বিখ্যাত জ্ঞানতাপস হাসান আল-বসরির শিষ্য। তাপস হাসান-বসরির নির্দেশেই তাঁরা বসরার প্রধান কেন্দ্রীয় মসজিদে নিয়মিত ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দিতেন। কথিত আছে, একদিন হাসান-আল-বসরির শিষ্যদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, যদি কেউ 'কবীরা গুনাহ' করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। গুরু হাসান-আল-বসরির এ মন্তব্য শুনে শিষ্য ওয়াসিল আতা বলেন ওঠেন–'হুজুর, আমার মতে সে ব্যক্তি কাফেরও নয়–মুসলমানও নয়'। একথা শুনে গুরু হাসান-আল-বসরি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন–'ইতাজাল আন্না'। অর্থাৎ দফা হো যাও-যার বাঙলা অর্থ দাঁড়ায়–বের হও। ঠিক তখনই ওয়াসিল ও আমর তাঁদের গুরুর সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং মসজিদের অন্য এক অংশে বসে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন মত প্রচার শুরু করেন।

ওয়াসিল আতা, হাসান আল বসরির কথিত ঐ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন–'কোরআন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বলে যে বর্ণনা আছে তাতে কবীরা গুনাহের পাপীকে মুমিন বা কাফের কিছুই বলা যায় না' অর্থাৎ সে মুমিনও নয় কাফিরও নয়। কিন্তু যে মুনাফেকের মুনাফেকি ধরা পড়ে না, সে লোকচক্ষে মুমিন। সুতরাং হাসান বসরি তাকে মুনাফিক বলতে পারেন না, যতক্ষণ তার মুনাফেকি ধরা না পড়ে। তাই একমাত্র পন্থা হলো ফাসিককে মাঝামাঝি অবস্থায় রাখা অর্থাৎ মানজিলাতুল বায়ানাল-মানজিলাতান।

ওয়াসিল বিন আতা ও আমর বিন ওবায়েদ 'কদর ও আদল'–বিষয়ক মত ছাড়াও কিছু নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূক্ষ-বিশ্লেষণ করেন। তাতে এ সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত মুতাজিলারা রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খলিফা ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ মুতাজিলা মত প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের পতনের পর মুতাজিলারা আব্বাসীয়দের কাছ থেকে উদার সমর্থন লাভ করেন। দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ছিলেন আমর বিন ওবায়েদের বন্ধু। পরে মুতাজিলারা খলিফা মামুনের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন লাভ করেন। মুতাজিলা মতবাদে যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য তা হলো মুতাজিলরা দার্শনিক, মুক্তচিন্তা, প্রগতিবাদী, যুক্তিবাদী, বুদ্ধিপন্থী ও উদারনৈতিক বলে পরিচিতি লাভ করেন। মুতাজিলীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন –

ক. আবুল হুজায়ল মুহাম্মদ ইবনুল হুজায়ল আল-আল্লাফ (মৃত্যু ৮৪০) :

আবুল হুজায়ল আল-আল্লাফ মুতাজিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক। শঙ্করের মতো আল্লাফও একজন শক্তিশালী তার্কিক ছিলেন। আল্লাহর অদ্বৈতকে র্নিগুণ সিদ্ধ করতে তিনি যে যুক্তি দেখান, তা শঙ্করের 'নির্বিশেষ চিন্মাত্র' তত্ত্বের সাথে মিলে যায়। আল্লাহর মধ্যে কোনো গুণ (বিশেষণ) থাকতে পারে না; কেননা গুণ দুই ভাবে থাকতে পারে, হয় তিনি গুণী থেকে বিচ্ছিন্ন, নয়তো গুণীস্বরূপ। গুণীবিচ্ছিন্ন মানলে তিনি অদ্বৈত নন, আবার অদ্বৈত নির্গুণ আল্লাহ তথা গুণ-স্বরূপ আল্লাহর মধ্যে শব্দেরই ব্যবধান হবে। হুজায়ল আল-আল্লাফ মানুষের কর্মকে দুই প্রকার বলে মনে করেছেন–এক. প্রাকৃতিক কর্ম অর্থাৎ কায়িক বা ইন্দ্রিয়গত, দ্বিতীয়ত. আচার (পাপ-পূণ্য) সম্মন্ধী বা হার্দ্যিক কর্ম। যে কর্ম আমরা বিনা বাধায় সম্পন্ন করতে পারি তাই-ই আচার-সম্মন্ধী কর্ম মানুষের অর্জিত সম্পদ, তার যত্নের ফল। আল্লাহ ও কোরআনের বাণী এবং কিছু নৈসর্গিক (প্রকৃতি) প্রকাশ থেকে মানুষ জ্ঞানার্জন করে। কোরআনিক বাণীকে জানার আগেও কখনো কখনো প্রাকৃতিক চেতনা দ্বারা মানুষ কর্তব্যজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে, যা পরে আল্লাহর-সম্মন্ধী জ্ঞান দান করে; ভালো-মন্দ জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি থেকে জন্মে ও সৎ, নিষ্কাম জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

খ. নজ্জাম (মৃত্যু ৮৪৫) :

নজ্জাম সম্ভবত আল্লাফের সহচর ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে নাস্তিক, আবার কেউ কেউ উন্মাদ বলে ধারণা করতেন। নজ্জামের মতে, আল্লাহর মন্দ কর্ম করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আল্লাহ তাঁর জ্ঞানানুযায়ী যে কাজ তাঁর ধার্মিক বান্দাদের জন্য ভালো বলে মনে করেন তাই শুধু করতে পারেন। বস্তুত যেটুকু তিনি করেন সেটুকুই মাত্র তাঁর সর্বশক্তিমত্তার সীমা। যার কোনো বস্তুর প্রয়োজন থাকে তারই ইচ্ছা থাকে, অতএব ইচ্ছাশক্তি আল্লাহর গুণ হতে পারে না। আল্লাহ একবারই সৃষ্টি করেন; প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে তিনি সেই শক্তি নিহিত করেন যার দ্বারা ভবিষ্যতেও তাঁর নির্মাণক্রম কার্যকরী থাকবে। নজ্জাফের কথা হলো : সকল সম্প্রদায়েরই কিছু ভূল ধারণা থাকতে পারে, যেমন মুসলমানদের একটা ধারণা হলো অন্যান্য নবি অপেক্ষা মুহাম্মদের আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হলো তিনি আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত; কিন্তু এখানে তো এটাই ভুল যে মাত্র একজনকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন; নবি শব্দটির অর্থানুযায়ী তো সকল নবিকেই আল্লাহ প্রেরিত বলে ধরে নিতে হবে।

গ. আমর ইবনে বাহার আল জাহিজ (মৃত্যু ৮৬৯) :

জাহিজ হলেন নজ্জামের শিষ্য। তিনি নামকরা লেখক এবং গম্ভীরচেতা দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনে করতেন সত্য নির্ণয়ের জন্য ধর্ম এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সমন্বয় সাধন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে, আর সেই কাজের মধ্যেই আল্লাহর প্রকাশ। মানববুদ্ধিই জ্ঞানের স্রষ্টা।

ঘ. মুআম্মর :

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দের মুতাজিলা দার্শনিক। মুআম্মর তাঁর পূর্বসূরিগণ অপেক্ষাও অধিক 'নির্গুণবাদী'। আল্লাহ সর্বপ্রকার দ্বৈত থেকে সর্বদাই মুক্ত অতএব তাঁর মধ্যে কোনো গুণ-বিশেষণের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ নিজেকে বা অন্য কোনো বস্তু বা গুণকে জানেন না, কারণ জ্ঞান স্বীকার করার পর জ্ঞাতা জ্ঞেয় ইত্যাদি নানা অসংখ্য দ্বৈত এসে হাজির হবে। মুআম্মরের মতে, গতি-স্থিতি সাম্য-অসাম্য সমস্তই কাল্পনিক ধারণা, এদের কোনো বাস্তবিক সত্য নেই। মানুষের ইচ্ছা বন্ধনহীন। ইচ্ছাই মানুষের একমাত্র ক্রিয়া। বাকি ক্রিয়াসমূহ কেবল শারীর-সম্বন্ধী।

ঙ. আবু হাসিম বসরি(৯৩৩ খৃস্টাব্দ) :

তাঁর মতে, আল্লাহর গুণ, ঘটনাবলি, জাতি (সামান্য) জ্ঞান-যুক্তি কিছু স্থিতি সত্তা ও অ-সত্তার মধ্যে অবস্থান করে। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সন্দেহের উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন।

উপরিল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায় যে, মুতাজিলা প্রবক্তাদের মতবাদ প্রধানত নিম্নলিখিত তত্ত্ব ও তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সেগুলো হলো :

১. আল্লাহর একত্ব;
২. আল্লাহর গুণাবলি (সিফাত);
৩. আল্লাহর দর্শন লাভ (দিদার);
৪. আল্লাহর কার্যকলাপ;
৫. ভাল-মন্দ বা সৎ-অসৎ;
৬. কোরআন চিরন্তন কিংবা সৃষ্ট;
৭. মানুষের চিন্তা ও কর্মে স্বাধীনতা; এবং
৮. বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য।

কোরআনে আল্লাহকে জ্ঞাতা (আলেম), শক্তিমান (কাদের), প্রাণবান (হাই) প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে সরল বিশ্বাসে মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ জ্ঞান, প্রাণ প্রভৃতি গুণের অধিকারী। কিন্তু মুতাজিলারা এ প্রচলিত মতের বিরোধী। তাঁদের মতে আল্লাহর কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে পারেন না। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং তাঁকে বহুগুণের অধিকারী বলে মনে করার অর্থই হবে তাঁর সত্তার বহুত্ব আরোপ করা। তাঁরা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ কারোর দ্বারা সৃষ্টি নন এবং তাঁর কোনো অংশিদার নেই। কিন্তু তাদের মতে আল্লাহ্ নিরাকার এবং স্বীয় সত্তার (Essence) অধিকারী। আল্লাহর কোনো গুণাবলির প্রতি তাঁরা কোন আস্থা রাখেননি, কারণ তাঁরা মনে করে যে, ঐ গুণাবলি আল্লাহর নিরঙ্কুশ একত্বকে ব্যাহত করবে। তাঁরা বলেন যে, আল্লাহকে উপলব্ধির জন্যই গুণাবলি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর নিরঙ্কুশ একত্ব প্রমাণ করার জন্য তাদের আহল-উল-তাওহিদ (Partisans of Unity- একত্ববাদী) বলে অভিহিত করা হয়।

রক্ষণশীল মুসলিমদের মতে কোরআনে বর্ণিত আয়াতভিত্তিক ধার্মিক ব্যক্তিগণ পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভ (Beatific Vision) করবেন। এর বিরোধিতা করে মুতাজিলারা বলে যে, যেহেতু আল্লাহ্ নিরাকার, কায়াহীন, তাই পরকালে পার্থিব চক্ষু দ্বারা আল্লাহর দর্শন লাভ অসম্ভব। আল্লাহকে পার্থিব রূপদান অধর্ম। সুতরাং চর্ম ও বাস্তব চোখে আল্লাহর দর্শন সম্ভব নয়। তবে রোজ কিয়ামতে ধার্মিক ব্যক্তিগণ সূক্ষ্ম আত্মিক অনুভূতির দ্বারা আল্লাহর দর্শন পেতে পারে।

কোরআনের প্রাথমিক সমালোচক হলো মুতাজিলারা, যাদের ইসলামের মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী দল বলা হয়। মুতাজিলারা গ্রিক ও আলেক্সান্দ্রিয়ান লেখকদের লেখার সাথে পরিচিত হওয়ায় তাদের জ্ঞান বিদ্যার সাথে পরিচয় হয়। তাই এরা অনেক গ্রিক ধারণা ন্যায়বাদ ও সন্দেহবাদসহ ইসলামি দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনায় প্রয়োগ ও আমদানি করেছিলেন।

কোরআন যে অনন্ত ও অসৃষ্ট, এই গোঁড়াবাদী মতবাদকে মুতাজিলারা মনে করেন যে এ ধারণা পোষণ করলে কোরআনকে আল্লাহর সমকালীন (Coeval) বলা হয় যা অবাস্তব। এ ধারণা তাদের মতে, দ্বিত্ববাদের ধারণা যা আল্লাহর একত্বের বিরুদ্ধে এবং শিরক, অংশিদারিত্ব। কারণ কোরআনকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমতুল্য ও অনন্ত করা হচ্ছে।

মুতাজিলারা আরো মতপোষণ করেন যে, কোরআনের বাণীর হাজার হাজার খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত মূল কপি, হাফসার কপিসহ যা সংকলকদের হেফাজতে ছিল সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এখন দাবি করা হয় যে এটি অনন্তকাল থেকে ছিল একরূপে এবং অপরিবর্তিত রূপে। কোরআনের স্টাইল ও রচনা দেখে বোঝা যায় এটা আহামরিও

নয়, অলৌকিক গ্রন্থও নয়। কোরআন খাঁটি আরবি ভাষায় লিখিত নয়, এর মধ্যে বহু বিদেশী শব্দ আছে। কোরআন মূলত মোহাম্মদ রচিত গদ্য-কাব্য, অন্য কিছু নয়। কোরআন সম্বন্ধে তাঁরা আরোও বলেন যে, এই গ্রন্থ অনিত্য জয়, সৃষ্ট ও উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান (মৃ. ৭৪৯)-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আব্বাসি খলিফাদের সরকারি সমর্থন পেয়েছে। আব্বাসী খলিফা মামুন (মৃ. ৮৩৩) ধর্মীয় আদালত গঠন করে এর প্রচলনও করেছেন।

যুক্তিবাদী ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী মুতাজিলারা, কোরআন যে অলৌকিক গ্রন্থ, গোঁড়াবাদীদের এই মন্তব্যকে মোকাবেলা করার জন্য প্রাচীন আরবি কবি ও জ্ঞানীব্যক্তিদের রচনা জনগণের মধ্যে বিতরণ করেছিল এবং দেখাতে চেয়েছিল যে এই প্রাচীন কবিদের রচনা স্টাইল এবং নৈতিক শিক্ষায় কোরআনের চেয়ে অনেক উন্নত। মুতাজিলা লেখক এবং আরবি গদ্যের একজন বিশেষজ্ঞ আমর ইবন বাহার (মৃ. ৮৬৯) আল জাহিজ নামে খ্যাত-বলেছিলেন যে, কোরআন রচনায় ও ভাষায় একটি ভালো গ্রন্থ বটে, তবে পরিপূর্ণ আরবি ভাষায় নয় (Not in perfection of Arabic)। দেখা যায় যে, মুতাজিলা সম্প্রদায় বিশ্বাস করে রক্ষণশীল মতবাদ অনুযায়ী কোরআন চিরন্তন হতে পারে না। কারণ একটা বিশেষ স্থান ও কালে তার সৃষ্টি হয়েছিল।

রক্ষণশীল ইসলামি মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট এবং ছয় দিনে সাত স্তরে এই পৃথিবী সৃষ্টি। অপরদিকে গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে পৃথিবী চিরন্তন। মুতাজিলারা দাবি করে পৃথিবী সৃষ্ট ও চিরন্তন। এরা বলে, পৃথিবী প্রাথমিক অবস্থায় নিস্তব্ধ ও নিশ্চল ছিল এবং তা চিরন্তনতার সপক্ষে বলা যায়। কিন্তু আল্লাহ্ এতে দেহ, প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছেন। তাদের এই মতবাদ মধ্যপন্থীদের মতবাদ। প্রাথমিক অবস্থায় মুতাজিলা তত্ত্ব ও তথ্যগুলো গ্রিক ভাবধারার প্রভাবে উদ্ভূত না হলেও পরবর্তী যুগে মুতাজিলা মতবাদের বিকাশে এরিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন হয়েছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। ও লিয়ারী যথার্থ বলেছেন যে, গ্রিক প্রভাব সিরীয় খ্রিস্টানদের মাধ্যমে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। (Arabic Thought and its place in History)।

মুতাজিলাদের তত্ত্বের প্রধান উৎস ছিল গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের দর্শন, চিন্তাচেতনা, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য তথা কোরাআনের বহু আয়াত, যেমন এতে (কোরআন শরিফে) সেই সমস্ত লোকের জন্য ইঙ্গিত রয়েছে যারা উপলব্ধি করে, যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিবেচনা করে শ্রবণ করে এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে। তাই এদের আহল আল কালাম অথবা যুক্তিবাদী গোষ্ঠী বলা হয়। তৎকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মুতাজিলারা ইসলামি দর্শন, মুক্তচিন্তা, প্রগতিবাদী-যুক্তিবাদী তথা বুদ্ধিবাদী হিসেবে ইসলামি রেনেসাঁর ধারক হিসেবে পরিচিত। মুতাজিলারা আজও তৎকাল এবং স্ব-কালের জন্য বিস্ময়।

তথ্যসূত্র :

১. বার্ট্রান্ড রাসেল - পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)।
বেঞ্জামিন ওয়াকার - ফাউন্ডেশন অব ইসলাম (অনুবাদ : সা'দ উল্লাহ)।
সা'দ উল্লাহ্ - ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক।
সা'দ উল্লাহ্ - ইসলামের ভিন্নমত ও ক্ষমতার লড়াই।
সা'দ উল্লাহ্ - ইসলামে ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠি।
ড. আমিনুল ইসলাম - ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন।
রাহুল সংকৃত্যায়ন - দর্শন দিগদর্শন।

কালের আয়নায় নারীমুক্তির হালচাল

এম এ আলিম

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে ছয় শত কোটির মত মানুষ রয়েছে। পৃথিবীর এই বিপুল জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশই নারী। নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত। প্রাচীনকালে নারী ও পুরুষ নিজেদের লজ্জা-সম্ভ্রম নিয়ে তেমন একটা ভাবত না। ভাবত না তাদের জীবিকা নিয়েও। নারী ও পুরুষরা তখন দলবদ্ধ হয়েই জীবিকা নির্বাহের জন্য ফলমূল সংগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার পশু-পাখি শিকার করত। বিশেষ বিশেষ রীতি-নীতির উদ্ভব না হওয়ার কারণে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ নারী-পুরুষের মাঝে তখন ছিল অবাধ যৌনাচার।

যৌনমিলনে নারীরা গর্ভবর্তী হত। বরের সূত্রে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করত। কখনো বা পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে তাদের সম্মুখে চরতে হত। আর তখনই ঘটত গর্ভবতী নারীদের জন্য বিপদ। কেননা, গর্ভবতী নারীদের উচুঁ ভূমিতে আরোহণ কিংবা চলাচল ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং পশ্চাদগামী। গর্ভবতী নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রেও ছিল অপারগ। কাজেই সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে সম্মুখে চলতে না পারার কারণে ক্রমে ক্রমে গৃহই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান আশ্রয়স্থল।

মধ্যযুগে সমস্ত পৃথিবীব্যাপীই যখন ধর্মীয় প্রভাবের ব্যাপক ছড়াছড়ি, তখন নারীরা বহিরাঙ্গন থেকে আরো গুটিয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে মুসলিম নারীরা। পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য অভিধায়। যে অভিধাসমূহের কোনো কোনোটি এমন কুৎসিত যে, বলা বাহুল্য। সমাজব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর থেকেই ক্রমে ক্রমে পুরুষ সমাজ চালানোর পুরো দায়িত্বভার গ্রহণ করে, আর নারীদের গৃহবন্দী করার জন্য তৈরি করতে থাকে বিভিন্ন সামাজিক শৃঙ্খল। পুরুষ নারীকে বন্দী করার জন্য তৈরি করেছে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র। সৃষ্টির পর থেকে পুরুষরা নারী সম্পর্কে যে সব শ্লোক-বিধি-বিধান তৈরি করেছে তার প্রায় সবটাই সন্দেহজনক ও আপত্তিকর। নারী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের সাজানো বিধিবিধানে ক্রমে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। পুরুষ নারীকে শেখায় তাকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করতে, পাশাপাশি ভয়ও করতে। কাজেই শৃঙ্খলিত নারীর অন্তরও পুরুষের প্রতি থাকে ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ পুরুষ নারীকে দাসী করে রেখেছে। ঘটনার ঘনঘটায় পড়ে কিংবা স্বীয় স্বার্থে ও অপ্রত্যাশিত ভয়ে পুরুষ কখনো কখনো নারীর জয়গান করে মহীয়সী রূপে কিংবা দেবী রূপে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরুষ শুধু তার জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্যই নারীকে প্রয়োজন এবং খানিক মূল্যবানও মনে করে আসছে। যৌনাচার সম্পন্ন করার মুহূর্তগুলিতে পুরুষরা নারীকে অভিহিত করতে থাকে বিভিন্ন মন ভোলানো নিছক অভিধায়। নারী তাতে বিগলিত হয়; কিন্তু স্বীয় অজ্ঞতায় ভূলে যায় পুরুষের এই সাজানো প্রতারণার কথা। সুদীর্ঘ সময় ধরে পুরুষরা নারীকে অবদমিত করতে করতে এতটাই করেছে যে, নারী এখন পুরুষের কোনো খারাপ কাজেরও বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়। নারীর যে নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে, তারও যে নিজস্ব চিন্তা চেতনা, মূল্যবোধ রয়েছে তা সে বেমালুম ভুলে যায়। প্রকৃত পক্ষে তারা, ভুলে যায় না, তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়।

নারীর বিবেকবোধ সুপ্ত; সে নিজেও যে পুরুষের ন্যায় স্বতন্ত্র সত্তা, তার চিন্তা চেতনা কর্মও যে মূল্যবান কিছু হতে পারে, সভ্যতার অগ্রগতিতে সেও যে মূল্যবান কোন অবদান রাখতে পারে–এমন প্রশ্ন হয়ত কোন কোন নারীর মনে কখনো কখনো জাগে, কিন্তু তা স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারে না। কেননা, সমাজ কাঠামোকে পিতৃতন্ত্র এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে, একা বা স্বল্পাংশের ক্ষুদ্র চিন্তনে তার মুক্তি সম্ভব নয়।

বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পুরুষতন্ত্রের সৌরলোকের সূর্য পুরুষ আর নারী হচ্ছে অন্ধকার। পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ মুখ্য, নারী গৌণ। পুরুষ প্রভু, নারী দাসী; পুরুষ শরীর, নারী ছায়া; পুরুষ ব্রাহ্মণ, নারী শূদ্রী পুরুষ বিকশিত, নারী অবিকশিত। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষ নিয়ন্ত্রক আর নারী নিয়ন্ত্রিত; পুরুষ শোষক; নারী শোষিত পুরুষ সভ্যতার শীর্ষে আরোহণ করে ক্রমে ধারাবাহিকভাবে জয়গান করে চলেছে নিজেদের। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় পুরুষের যত জয়গান করা হয় ততই করা হয় নারীর জন্য নিন্দা। নারী অক্ষম, অথর্ব, পরনির্ভরশীল ইত্যাদি।

নারীর প্রারম্ভিক রূপ হচ্ছে শিশু। কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে। (নারী, হুমায়ুন আজাদ, পৃষ্টা ১৯)

একটি মেয়ে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর যেদিকে তাকায় সেদিকেই দেখে পুরুষের আধিপত্য। গোটা পৃথিবীটাই যেন পুরুষের। পিতৃতন্ত্রের পরিবার শেখায় পুরুষ প্রধান, সমাজ শেখায় পুরুষ প্রধান, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যম, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শেখায় পুরুষ প্রধান অবস্থা দেখে মনে হবে যেন সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থা পুরুষের প্রাধান্য প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের সংস্থা। সতীত্ব নারীকে পুরুষের দেওয়া একটি উপাধি। শরৎচন্দ্র, অনিলা দেবীর ছদ্মনামে বলেন, "...সতীত্বের বাড়া নারীর আর গুণ নাই। সব দেশের পুরুষই একথা বোঝে, এটা পুরুষের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় সামগ্রী। ... এই সতীত্ব যে নারীর কতবড় ধর্ম হওয়া উচিত, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে সে কথার পুনঃপুনঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ...এখানে স্বয়ং ভগবান ইন্দ্র পর্যন্ত সতীত্বের দাপটে কতবার অস্থির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্য তর্কই একতরফা একা নারীর জন্য।"

পুরুষ এখনো নারীকে দেখে ভোগ্যপণ্য রূপে। গুন্টার গ্রাসের বিখ্যাত একটি কবিতায় আমরা তারই চিত্র স্পষ্ট দেখতে পাই :

পুরুষ চুষতে দেয়না
বড় ওলান ঝুলিয়ে গাভী যখন
বাড়ীর পথে রাস্তা পেরোয়, যানবাহন থামিয়ে দিয়ে
পুরুষরা আড় চোখে তাকায়
পুরুষ কেবল তৃতীয় স্তনের স্বপ্ন দেখে
পুরুষ দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ঈর্ষা করে ...
(গুন্টার গ্রাস সংকলন, পৃষ্টা ১৯)

উপনিষদের ঋষি স্ত্রী সম্পর্কে মনু ও তাহার পোষাক সামন্ত সমাজ হতে বহু স্পষ্ট উক্তি করেছেন। ঋষির বক্তব্য ছিল স্ত্রীর নিজের রুচির জন্য স্ত্রী প্রিয় হয় না, পুরুষের রুচি বিধানের জন্যই স্ত্রী প্রিয় হয়।' (নবৈ ভার্যায়া : কামায় ভার্ষা প্রিয়া ভবতি। আত্মানন্ত কামায় ভার্ষা প্রিয়া ভবতি ॥ (মানব সমাজ, ১৪২) নারীদের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। তারা পরাধীন। এ বিষয়ে একটি নীতি বাক্য করতে পারি–কুমারী কালে তাহার রক্ষক পিতা যৌবনকালে পতি এবং বার্ধক্যেও রক্ষক হবে পুত্র; স্ত্রীর কখনো স্বতন্ত্রতা থাকা উচিত নয়।'

[পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। পুত্র রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রি স্বাতন্ত্র্যমহতি ॥ মনুসংহিতায় বিধবা বিবাহ নিয়েও রয়েছে পিতৃতন্ত্রের এক স্বেচ্ছা লোলুপ ইতিহাস। সামন্ত যুগে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন হবার ফলেই বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। পরে হিন্দুরা ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে এটাকে প্রচণ্ড ধার্মিক নিষেধ হিসেবে খাড়া করে। এখানে মনে রাখতে হয় যে, এই আমৃত্যু বৈধ স্ত্রীর কোন স্বেচ্ছা প্রণোদিত নিয়ম নয়; কারণ সামন্ত যুগে ধর্ম না হোক, সমাজ সর্বদাই বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিল। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় ভারতবর্ষের উচ্চকুলে মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহ এখন পর্যন্ত বর্জিত আছে। ক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করে পুরুষ নীতি ভেঙেছে এবং নারীদের কুক্ষিগত করার জন্য সুবিধামতো নীতি তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মুঘল আমলে কয়েক পুরুষ ধরিয়া রাজ কুমারীদের অবিবাহিত থাকার রীতি ও চলিত ছিল; জানা যায় ঔরঙ্গজেব সম্রাট হইবার পর এই রূঢ় প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, মানব সমাজ; পৃ. ১৪৩)

এর পর পিতৃতন্ত্রের প্রবহমান নৈতিকতায় ক্ষমতার দৌরাত্ম ক্রমশই এগিয়ে চলে; যেথা নারী পুতুলেরই অনুরূপ। "স্ত্রীর অবস্থা সমাজে ক্রমেই খারাপ হইয়াছে, ক্রমেই তাহার মৌলিক অধিকারগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং শেষে স্ত্রী বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় না; কেবল গোপনে বিষয়ে গুটির মতো এই নির্মমতাকে কণ্ঠলীন করে নেয়। এর কারণ খুবই স্পষ্ট পিতৃতন্ত্রের সমাজ কাঠামো এমনভাবে তৈরি যে, স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারে সমাজের নাক কান কাটা যাবে আর পুরুষের ভ্রষ্টাচারকে সমাজ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও নারীদের স্বাধীনতা নেই; পুরুষই নির্ধারণ করে দিয়েছে নারী কী পোষাক পরবে। দীর্ঘদিন ধরে নারীর অবদমিত হৃদয়ে পিতৃতান্ত্রিক প্রভাবে দাসীবৃত্তি মনোভাব ঠাঁই করে নিয়েছে। নারীবাদী রোকেয়া বলেছেন আমাদের মন পর্যন্ত দাস হইয়া গিয়াছে। (রোকেয়া রচনাবলী, ১৭) তিনি আরো বলেন, শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড় (রোকেয়া রচনাবলী, ২৫); আমাদের শয়ন কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রুপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। (রোকেয়া রচনাবলী, ২৬); বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিস্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। (রোকেয়া রচনাবলী, ২৮)

তাই নারীর জন্য এই দাসীবৃত্তি মনোভাব পরিহার করা আবশ্যক। এ জন্য চাই স্বাতন্ত্র্যবোধ।

'স্বাতন্ত্র্য' হবে অসামান্যতার প্রতীক। তার মনোভূমি হবে সৃজনশীল-নিত্য বাসন্তী হাওয়া বইবে তাতে। ভাঙ্গনে থাকবে তার বেদনাবোধ, গড়নে জাগবে উল্লাস। (আহমদ শরীফ রচনাবলি, ১২৩)

তাই কালিক প্রহরে নারীমুক্তির জন্য প্রয়োজন স্বীয়চিত্তের জাগরণ, জীবনের জাগরণ। জীবনের যখন জাগরণ আসে,

তখন মানুষ উন্মুক্ত হয়ে উঠে আত্মপ্রসারে। তখন তাজা প্রাণ ঘিরে থাকে সৃষ্টি সুখের উল্লাস… তাই প্রগতি কিংবা অগ্রগতি আসলে মনেরই চিন্তা ভাবনার ফসল। (আহমদ শরীফ রচনাবলি, ১২৩)

পুরুষের কামবৃত্তি প্রবল। অবশ্য নারীর ও যে নেই তা নয়; তবে পুরুষ শুধু নারীর যৌনকাম চরিতার্থ করার জন্যই নারীকে আবেগাকুলতায় কাছে টানে। আবেগে হয়ে পড়ে বিহ্বল, উন্মুক্ত। এ প্রসঙ্গে টোকন ঠাকুরের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণ যোগ্য :

‘…একজন নারীর মধ্যে সমুদ্র আছে, বন্দর আছে জাহাজও আছে।
আর অসংখ্য পুরুষ জাহাজের ডকে কম বেতনের গতরখাটা
খালাসি হয়ে মাসের পর মাস সমুদ্রে বসে থাকে।
বহুদিন সে তার বাড়িতেও ফেরে না।’
(সমকাল, কালের খেয়া, ১০.১১.২০০৬)

নারীরা পুরুষের তৈরি প্রথায় এখনো বন্দী। অসুস্থ ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা যেমন অসুস্থ থাকে, তেমনি প্রথায় বা শৃঙ্খলের গণ্ডিতে বেড়ে ওঠা নারীর অন্তর ও শৃঙ্খলিত থাকে। এমতাবস্থায় থাকে তার স্বীয় অধিকার। অবশ্য, নারীরও যে স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, তারও যে স্বীয় অধিকার প্রয়োজন, স্বাধীনতা প্রয়োজন, এমন চিন্তাও তার অবচেতনেই থেকে যায়। নারীর অধিকার নিয়ে একগোত্র পুরুষ উনিশ শতক থেকে লড়াই করেছেন নারীর পক্ষে। তাদের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের রয়েছে সমান অধিকার। তাছাড়া নারী ও পুরুষের উভয়ের মূল পরিচয় হচ্ছে তারা মানুষ। নারীবাদী রোকেয়ার চোখে পুরুষ শব্দটিই ছিল আপত্তিকর। তিনি পুরুষকে উপহাস করছেন, তাকে গণ্য করেছেন পশুর থেকেও নিকৃষ্টরূপ। তিনি বলেন, ‘যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদগুন বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।” (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ১৭০) পুরুষতন্ত্রের তৈরি এক ঐশী ভাবাদর্শ ‘স্বামী’ যা পুরুষকে উত্তীর্ণ করেছে নারীর বিধাতার স্তরে। ‘স্বামী’ তাঁর কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দ। তিনি প্রশ্ন করেছেন, শ্রীমতিগণ জীবনে চিরসঙ্গী, শ্রীমানদিগকে ‘স্বামী’ ভাববেন কেন? (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ৪৩) তিনি এ শব্দটি বাতিল করে প্রস্তাব করেছেন একটি নতুন শব্দ: আশা করি এখন ‘স্বামী’ স্থলে ‘অর্ধাঙ্গী’ শব্দ প্রচলিত হইবে। (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ৪৪)

পূর্বেই বলেছি, পুরুষের তৈরি করা প্রথায় নারীরা এখনো বন্দী। আর সে প্রথায় নিমগ্ন হয়েই নারীরা অলঙ্কার পরে। নারীর অলঙ্কার নিয়েও রোকেয়া তীব্র পরিহাস করেছেন। তার মতে, ‘আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি–এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয়ে বটে; কিন্তু অনেক মান্যগন্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (Originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায়, কারাগারে বন্দীগণ পায়, লোহনির্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ রৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ মল পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বার্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ দেখি, উহাদেরই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। … গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া ‘নাকাদড়ী’ পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী ‘নোলক’ পরাইয়াছেন! ঐ নোলক হইতেছে স্বামী’র অস্থিত্বের (সধবার) নিদর্শন! (রোকেয়া রচনাবলী, পৃ: ১৯-২০)

তাঁর মুখেই আমরা শুনতে পাই নারীমুক্তির এক চরমবাণী–“কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের জন্য বস্ত্র উপার্জন করুক।” (রোকেয়া রচনাবলি, পৃ: ৩০)। আঠার শতকের এক বিপ্লবী নারীবাদী লেখিকা মেরি তাঁর দুর্বল লিঙ্গীয় শ্রেণীর শরীর ও মনে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ‘একমাত্র উপায়ে নারীরা পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে–বিয়ে ব’সে। এ কামনা তাদের পশুতে পরিণত করে, যখন, তাদের বিয়ে হয় তখন তারা এমন আচরণ করে যা শুধু শিশুদের কাছেই আশা করা যায়–তারা সাজগোজ করে, তারা রঙ মাখে।’ (এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ ও ম্যান)

শিক্ষার মাধ্যমে নারীর চিন্তা–চেতনার প্রভূত উন্নতি সম্ভব। নারীরা যেহেতু গৃহপরিবেশে পিতৃতন্ত্রের প্রবাহমান ধারায় বেড়ে ওঠে তাই তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছুর জন্যই পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। নারীদের এই গৃহমনোভাব, পরনির্ভরশীলতার জন্য পুরো সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার ও অনগ্রসর মনোভাবই দায়ী। অশিক্ষা ও সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবেই কারণেই নারীরা আজও স্বাবলম্বী নয়। জীবন চলার পথে নারীদের মতামতের বিশেষ মূল্যায়ন করা হয় না বললেই চলে। পিতৃতন্ত্রের বিশ্বাস–তারা প্রয়োজনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যেমন–উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–‘বিয়ে’। বিয়েতে সাধারণত গ্রামীণ অধিকাংশ মেয়েরই মতামতের মূল্যায়ন হয় না; শুধু গ্রাম নয় শহরেও খুব স্বল্পাংশ মেয়েরেই মতামতের মূল্যায়ন হয়, যা মোটের তুলনায় খুবই নগন্য। আজও কনে দেখার মানে তার রূপ, দেহের বাহ্যিক গঠন (দাঁত, কান, নাক, হাত, কেশ, সুগঠিত স্তন) পছন্দ করা। অনেকটা বাজারে ভাল গরু ক্রয়-বিক্রয়ের মত ঘটনা আর কি! বর্তমানে অবশ্য নারীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায়, তবে তা মোটের তুলনায় খুবই অপ্রতুল নয় কি? উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ পেলে তারা পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণ

করতে পারে। পারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিতে। ইংল্যান্ডের মার্গারেট থেচার, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দর নায়েক, বাংলাদেশের খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা, নারী শিক্ষা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের নেত্রী বেগম রোকেয়া এবং পাকিস্তানের আসমা জাহাঙ্গীর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নারীদের সম্পর্কে এতকাল ধরে যে সমস্ত ভ্রান্ত ও কুসংস্কার সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আছে তা একদিনে যেমন পরিবর্তন সম্ভব নয় তেমনি স্বল্পাংশের প্রচেষ্টায় ও তা দূরীভূত করা সম্ভব নয়। নারীর নিজের অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে নিতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবে না। নারীর নিরঙ্কুশ মুক্তি তখনই ঘটবে–যখন নারীর ভবিষ্যৎ মানুষ হওয়া, নারী হওয়া, নারী থাকা নয়।

হায় স্বপ্ন! হায় সভ্যতা!

লিটন দাস

দিনবদলের সাথে আমরাও প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছি। আমরা আমাদের মনুষত্বকে বিক্রি করে দিয়েছি অন্যদের হাতে। ওরা আমাদেরকে যে ভাবে ইচ্ছা সেভাবে নাচাচ্ছে। আমরা প্রতিবাদ করা ভুলে গেছি। অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে নীরবতা ভেঙেছি আবার প্রয়োজনের সময় নীরব থেকেছি। আমরা আমাদের সভ্যতাকে ভুলে গিয়ে অন্য কোনো অসভ্যতাকে গ্রহণ করেছি। বিশিষ্ট দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)বলেছিলেন "ধর্ম হচ্ছে গরিবের আফিম"। আজ সেই আফিমের নেশার মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা সেই আফিমকে আমাদের জীবনের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছি যাতে করে আমরা অসভ্য না হয়ে যাই। আমাদের সব সময় মনের মধ্যে অর্থ্যাৎ মাথার মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করে আসছে, যে লোকটি এই আফিম গ্রহণ করবে না সে কখনও ভাল মানুষ হবে না! সেই লোকটি হয়ে যাবে কাফির। আমাদের নিজস্ব সভ্যতাকে হারিয়ে আজ এই আফিমের অসভ্যতার বর্বরতা মনে-প্রাণে গ্রহণ করছি, অথবা করতে বাধ্য করছি। আমাদের দেশের মুক্তিযোদ্ধারা আজ দারিদ্র্যের জরাজীর্ণ পরিবেশে অসহায়ভাবে জীবন কাটাচ্ছে অথচ কেউ একটা প্রতিবাদ করে না রাজপথে নেমে। আর এদিকে আফিমসেবনকারীরা কী দাপটে গাড়ি, বাড়ি, রাজপথ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি দেশটা পর্যন্ত ওদের কালো হাতের মুঠোর ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এরপরও ওদেরকে সাপোর্ট করি। ওদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করি।

বিনোদণের মাধ্যম টিভি। টিভি চালু করলে বিজ্ঞাপনে দেখতে পাওয়া যায় অসভ্যতার নিদর্শন। কয়েকটা বিজ্ঞাপন যেমন–

"একা একা খেতে চাও, দরজা বন্ধ করে খাও!"

"একটা মেয়ে দৌড়ে আসছে ট্রেনে উঠার জন্য–

অথচ তার হাতটি কালো হওয়ায় তার হাতটি কেউ ধরছে না"

ফেইস পরিস্কার, তুলতুলে না হওয়ায় সে ভাল পারফরম্যান্স করতে পারছেনা।'

"একটি সিগারেট খাওয়ার জন্য একটা সুন্দরী মেয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরছে ইত্যাদি এই রকম লেখলে কয়েকশটা লেখা হয়ে যাবে। উপর্যুক্ত বিজ্ঞাপনগুলো কি সভ্যতা না অসভ্যতার চিহ্ন? মেয়েদেরকে আমরা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে খারাপ হবে না ভাল হবে সেটা চিন্তা না করে ব্যবসার লাভ হবে না ক্ষতি হবে সেটা চিন্তা করি। ব্যবসার লাভের জন্য মেয়েদেরকে যদি ভোগ্যপণ্য করতে হয় তবুও তারা করবে। এই ধরনের রাষ্ট্র থেকে আমাদের জানার বা শেখার কী আছে?

আমরা কি এই রকম একটা রাষ্ট্র গড়তে পারি না। যে রাষ্ট্র মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করবে। লেডিস ফার্স্ট না হয়ে সম অধিকার হবে। কেউ না খেয়ে মরবে না। সবাই রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে পাঁচটি বিষয় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষা বিনামূল্যে পাবে। কোন প্রাইভেট হাসপাতাল থাকবে না। কোন প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে না। কোন প্রাইভেট টিউটর, কোচিং সেন্টার থাকবে না। সব রাষ্ট্র বহন করবে। যে রাষ্ট্রের ধর্ম হবে মানবিকতা, কারণ সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।

আর এই রাষ্ট্রের নাম যদি হয় বাংলাদেশ তাহলে আপনি ভাববেন এটা স্বপ্নের কথা, বাস্তবে হবে না। যদি আপনারা আমাদের পাশে থাকেন তাহলে বাংলাদেশকে আমরা এই রকম আফিমবিহীন একটি রাষ্ট্র গড়ব আর সেই দিন বেশি দূরে নয়।

ধর্মবিশ্বাসে যুক্তির সংকট
সৈকত চৌধুরী

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ করে আসছে। তবে প্রথম দিকে তা ছিল অসংগঠিত; কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস ও তার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ধর্ম সংগঠিত হতে শুরু করে এবং জটিল আকার ধারণ করে। আধুনিক যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম দেখা যায়। যেমন- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, শিখ, ইহুদি, বাহাই ইত্যাদি। আবার বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই ধর্মহীন।

বিশ্বাস বনাম যুক্তি

ধর্মগুলোর প্রধান শর্ত ও একমাত্র অবলম্বন 'বিশ্বাস'। ধর্মগুলোকে কখনো যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, যদিও প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ ধর্মের অনুকূলে অনেক যুক্তির অবতারণা করে; তবে তা কখনও যথার্থ যুক্তি হয়ে ওঠেনি। ধর্মগুলোকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলেই হয়ত তা ধর্ম, নইলে তা পরিণত হত বিজ্ঞানে। প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, যুক্তি নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ কেউ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু তা ধর্মের কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ঠিক যেন পরস্পর বিপরীতমুখী; কেননা বিশ্বাসের প্রশ্ন তখনই আসে যখন তার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ সম্ভব হয় না। যা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন সম্ভব, তাকে বিশ্বাস করার জন্য কেউ বলবে না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞানের কথা বলা যায়। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, তাই বিজ্ঞানের কোনো বিষয় বিশ্বাস করার জন্য কাউকে আহ্বান জানানো হয় না, যেমনটি ধর্ম করে সব সময়। বিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারে কেবল মিথ্যাই। সত্য সবসময়ই সত্য। বিশ্বাসের জন্য নেই তার অপেক্ষা। ধর্মগুলোর বিষয়ে আরেকটি কথা না বললেই নয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সকল মানুষ যদি ঠিক এ মুহূর্তে ঐ ধর্মকে অবিশ্বাস করে তবে, তাৎক্ষণিক তার বিলুপ্তি ঘটবে। তাহলে ধর্মগুলো কি শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়? একমাত্র মানুষের বিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের আলাদা কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

স্রষ্টায় বিশ্বাস

স্রষ্টায় বিশ্বাস ধর্মগুলোর প্রধান ভিত্তি। তবে স্রষ্টা বিষয়টি একেক ধর্মে একেক রকম। তাঁর বৈশিষ্ট্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, এমনকি নামেও। হিন্দুরা স্রষ্টাকে বলেন ঈশ্বর কিংবা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ, খ্রিস্টানরা গড, ইহুদিরা জেহোভা। বিশ্বাসীরা স্রষ্টাকে বলেন আদিকারণ(First Cause)। তারা বলেন সব ঘটনার পেছনে যেহেতু কারণ আছে তাই এ মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় ঘটনার পেছনে এমন একটি বিশেষ কারণ থাকতে হবে যার আর নিজের কোন কারণ নেই (Uncaused cause)। আর এই বিশেষ কারণকেই তারা অভিহিত করেছেন ঈশ্বর হিসেবে। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই মনে করি, আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না, কেননা পূর্বসংস্কার সব সময়ই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেয়। এবার আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই, সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। আবার সেই কারণের পেছনেও একটা কারণ আছে। যাই হোক, আমরা আমাদের চিন্তার উৎস হিসেবে এ কথাটিকে নিতে পারি, 'সবকিছুর পেছনে একটা কারণ আছে'। এবার আমরা, কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরে নেই, 'সব কিছুর পেছনে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি সবকিছুর কারণ, তার আর কোনো কারণ নেই'। এবার আমাদের চিন্তার উৎসের দিকে নজর দেয়া যাক-'সব কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তা আমাদের চিন্তার এই ফলাফল-'সব কিছুর মূল কারণ ঈশ্বর, তার কোনো কারণ নেই' এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী। আমাদের চিন্তার উৎস যেহেতু 'সবকিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তাই ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ থাকবে না তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেন, "If everything must have cause, then God must have a cause"। আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি, সবকিছুর পেছনে যদি একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় তবে তিনি আল্লাহ বা ঈশ্বর যাই হোন না কেন, তার পেছনেও একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে।

আদিকারণের বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আদিকারণ যে এক ও অদ্বিতীয় তার যুক্তি কী? এমনও কি হতে পারে না, আসলে আদিকারণ একটি নয় একাধিক। এ প্রসঙ্গে ইসলামের স্পষ্ট বক্তব্য হল, 'আসমান ও জমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আম্বিয়া-২২)

এবার আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই একাধিক মানুষ মিলে সাধারনত একজন থেকে অধিকতর ভাল ও সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারে। বর্তমান যুগে অনেক কিছুই বহু মালিকানাধীন, যা নিয়ে দ্বন্দ্ব খুব কমই হয়। তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? একজনের বেশি হলেই তারা কেন মধ্যযুগীয় রাজার মত একজনের ওপর আরেকজন প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করবেন অথবা পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ধ্বংসে মেতে উঠবেন, তা বোধগম্য নয়। এছাড়া তারা একেকজন যদি নিজের মত করে একেকটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন তাতেই বা বাধা কে দিবে? আবার তারা সকলে মিলে সবার মতানুসারে একটি মহাবিশ্ব তৈরি করলেই বা সমস্যা কোথায়? এছাড়া তাদেরকে যে একটা কিছু তৈরি করতেই হবে এমনও তো নয়। তাই একত্ববাদের যুক্তি কতটা গ্রহনযোগ্য তা ভেবে দেখতে হবে।

উদ্দেশ্যবাদীরা বলে থাকেন, স্রষ্টা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার মানুষ তৈরির উদ্দেশ্য একেক ধর্মে একেক রকম। যেমন- ইসলাম ধর্মমতে, 'জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' (৫১: ৫৬)
এখানে প্রশ্ন এসে যায়, স্রষ্টার তো কোন অভাববোধ থাকতে পারে না এবং ইবাদতেরও তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কেন মানুষকে ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করলেন। বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানে আমরা জানি মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি বিন্দুসম। আর এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো আছে তা নিশ্চয়ই স্রষ্টার জন্য বড় একটা ব্যাপার হতে পারে না। আধুনিক যুগের পূর্বে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত সকল মানুষই ছিল নিরক্ষর। আধুনিক যুগেও এসে মানুষকে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করা যাচ্ছে না। সেই মানুষগুলোকে স্রষ্টা কেনই বা এত উচ্চাশার সাথে তৈরি করলেন।

মানুষের চেয়ে উন্নততর কোনো প্রাণী নেই বিধায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আঁচ করতে না পেরে নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান মনে করতে থাকি। তাই হয়ত কল্পনা করি যে, অসীম জ্ঞানী স্রষ্টা আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হবেন না কেন।

এখানে আরেকটি কথা এসে যায়, ধর্মগ্রন্থসমূহ মতে যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়েছে? আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই কখনো মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি হয় নাই। এছাড়া মানুষ সাধারণত ধর্মের দৃষ্টিতে যতটা না সৎকাজ করে তার তুলনায় অসৎ কাজ করে ঢের বেশি। এবার কেউ হয়ত বলতে পারেন স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষা করছেন। তাহলে বলব, পরীক্ষার ফল কি হল? তিনি কেন তুচ্ছ মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এটা কি তার পবিত্রতার বরখেলাপ নয়? যেহেতু সকল ধর্ম মতেই স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই আপত্তিটি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করা যায়।

অনেকে আবার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মহাবিশ্বের শৃঙখলার দোহাই দেন। এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ বলেন, 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোনো মূর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

অনেকে এমনও বলেন, স্রষ্টাকে আপনি বুঝবেন না। স্রষ্টাকে যদি নাইবা বুঝি তবে তাকে বিশ্বাস করব কিভাবে? যেখানে একেক ধর্মে একেক ধরনের স্রষ্টা; এছাড়া তার অস্তিত্বের বিরোধিতা অনেকেই করেছেন। আর আমরা স্রষ্টাকে না বুঝলে তিনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলা হয়, তা পূর্ণ হবেই বা কিভাবে? অবশ্য স্রষ্টা বিষয়টি মানুষের যদি অবোধগম্য হয়, তবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। কেননা তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষকে তাঁর আরাধনা বা স্তুতির জন্য নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এটি অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের(Deist) বিশ্বাস। যদিও এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই, তবে তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না, বিধায় তা মন্দ নয়। আরেকটি কথা, আমরা সাধারণ বলে থাকি স্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা বেমালুম ভুলে যাই যে, আমরা নর ও নারীর (পিতা-মাতা) মাধ্যমে জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্ম সম্পূণই তাদের (পিতা-মাতা) ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিভিন্ন ধর্মমতে স্রষ্টার বিভিন্ন গুণ রয়েছে। যেমন- তিনি খুশি হন, রাগ করেন, দেখেন, শোনেন, বুঝেন। বলা হয় তিনি নিরাকার। আবার তাঁর নূর বা জ্যোতি রয়েছে! এছাড়া স্রষ্টার দুটি গুণ অসীম দয়ালু ও ন্যায়বিচারক পরস্পরবিরোধী। যিনি ন্যায়বিচারক, তিনি দয়ালু হন কিভাবে আর যিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়বিচারক হন কিভাবে? এছাড়া তার রয়েছে সিংহাসন (আরশ); স্রষ্টাকে বলা হয় অসীম আবার তাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। স্রষ্টাকে বলা হয় তিনি অসীম ক্ষমতাবান। তাহলে তিনি কি এমন কিছু তৈরি করতে পারবেন যা তিনি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। প্রশ্নটির উত্তর হ্যা বা না যেটিই হোক তা তার অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। এছাড়া স্রষ্টা বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, স্রষ্টার কি এমন কোন গুণ রয়েছে যা সীমিতভাবে মানুষের মধ্যে নেই? তা তো থাকার কথা ছিল, কিন্তু নেই। এতে বিষয়টি পরিস্কার যে, মানুষের পক্ষে স্রষ্টার ও তার গুণাবলির কল্পনা সম্ভব এবং মানুষ তা-ই করেছে।

বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বর্গ, পৃথিবী, জীবজগৎ ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর তিনি অ্যাডাম ও ইভ নামক প্রথম মানব-মানবীকে মাটি থেকে তৈরি করে প্রাণ দেন। সৃষ্টিমুহূর্তে পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূণ্য এবং মহা অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশ্ব মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে ধ্বংস হবে আর ঐ দিনই ঈশ্বর সকলের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

বাইবেল গ্রন্থটি স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদ রেজা তাঁর 'ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস' (*দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ৯৩-৯৪) প্রবন্ধে মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করেছেনঃ

১। মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১: ১১-১২) মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১ঃ ৭-৯)।

২। জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬) জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)

৩। আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২: ১৭) আদম ৯৩০ বছর বেঁচেছিল (জেনেসিস ৫: ৫)

৪। ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১: ১৩) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২ : ১/২ স্যামুয়েল ২৪ :১)

৫। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারে না (জন ১ : ১৮/১ টিম ৬ : ১৬) অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬ : ২/ এক্সোডাস ২৪ : ৯-১০, ৩৩ : ২২-২৩)

৬। কেউই ঈশ্বরের মুখদর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩ : ২০) জেকব ও মুসা দুজনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২: ৩০, এক্সোডাস ৩৩ : ১১)

বাইবেল ও কোরানের মতে পৃথিবী স্থির। বাইবেলের এই ধারণার কারণে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল খ্রিস্টান ধর্মপুরুষরা। এবার কোরানে আসা যাক। কোরানের ভাষায়-

'নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।' (৩৫:৪১, তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন)

'ইহা তার নিদর্শনসমূহ-আসমান জমিন তারই হুকুমে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' (৩০:২৫) বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ মাও. ফজলুর রহমান মুন্সি। সৃষ্টিসম্পর্কে কোরানের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন আরশ ছিল পানির উপরে।' (১১:৭)

(উল্লেখ্য আরশ শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন)

'আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন' (২৪:৪৫) আবার কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের আরশ বহন করবেন' (৬৯:১৭)

সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত মতে, মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকলে তার সম্পত্তির মা পাবে ১/৬, বাবা ১/৬, দুই মেয়ে ২/৩ ও স্ত্রী ১/৮ অংশ। তাহলে মোট অংশ দাঁড়ায় (১/৬+১/৬+২/৩+১/৮) = ২৭/২৪ অংশ, যা মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি। পরে হজরত আলী তা সংশোধন করেন, যা ফরায়েজে আইনে 'আউল' নামে পরিচিত।

সূরা ফাতেহার চার থেকে সাত নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? কেননা আয়াতগুলোর পূর্বে ' কুল' বা বলো বা 'এই বলে প্রার্থনা করা' বলা হয় নাই।

এছাড়া সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা নাকি অন্য কোন সূরার বা সূরা আনফালের অংশ তা নিয়ে বিভেদ আছে। সূরা ফীল ও কোরাইশ এক সূরা নাকি পৃথক দুটি সূরা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। তাছাড়া কোরানের আয়াত, শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা নিয়ে বিভেদ রয়েছে, তা অনেকেই খেয়াল করেন না।

এবার আসি হাদিসে। আবু যর গেফারি (রা.) একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জানো? আবু যর বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক সূর্য আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। (তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১১৩৩)

এখন প্রশ্ন হল পৃথিবীর এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলে অন্য জায়গায় থাকবে দুপুর, আরেক জায়গায় থাকবে সূর্যোদয়। তাহলে যা বলা হল, তার ব্যাখ্যা কী?

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, হিন্দুধর্মের মনুসংহিতার ঋষি তা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'এই যে বিশ্বসংসার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ তা ছিল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকার জগৎ ছিল আমাদের জ্ঞানের অতীত, কোনো লক্ষণের সাহায্যে এ সম্পর্কে অনুমানের কোনো উপায় ছিল না। এই জগৎ ছিল অজ্ঞেয়, যেন সর্বতোভাবে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই প্রলয়াবস্থার পর স্বয়ম্ভু সূক্ষ্মরূপী ভগবান পঞ্চমহাভূত প্রভৃতিতে ব্যক্ত করলেন- তিনি অমিততেজা, প্রলয়াবস্থার বিনাশক রূপেই যেন আবির্ভূত হলেন।' (মনুসংহিতা ১: ৬-৭)

সৃষ্টির আদিতে কী ছিল তা ঐতিরেয় উপনিষদে বিবৃত হয়েছে- 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এই রূপ ঈক্ষন করিলেন- "আমি লোকসমূহ সৃজন করিব"।' (১:১:১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে, 'পূর্বে কিছুই ছিল না, এই জগৎ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল, কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু। 'আমি সমনস্ক হইব'- এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক (জল) উৎপন্ন হইল।' (১:২:১) 'জলই অর্ক। উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল; এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্টি হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত সেই মৃত্যু থেকে তেজোরস নির্গত হইল; (ইনিই) অগ্নি অর্থাৎ বিরাট।' (১:২:২)

এ বর্ণনা থেকে এটাই উপলব্দি হয় যে, হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তা আদিম কল্পনা বৈ কিছু নয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, যুক্তির সাথে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব প্রকট এবং বিরাট। যুক্তির ওপর ভর করে বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে। আর বিশ্বাসের ওপর ভর করে ধর্মগ্রন্থগুলো। এখন আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন?

আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে মনে করি- ধারণ করি, আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে হবে, যার যার নিজের ভাষায়, যুক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে হবে ধর্মগ্রন্থে বাণীসমূহের মর্মার্থ। শুধু পুণ্যলাভের আশায় পবিত্র ভাষায় না বুঝে, পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। না বুঝে পাঠ করলে শুধুই অজ্ঞতাই বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান বাড়ে না। আর এই অজ্ঞতা নামক দুর্বলতার সুবিধা নেয় আমাদের চারপাশের কিছু ভণ্ড মোল্লা-মৌলভি, পির-ফকির, ঠাকুর প্রমুখেরা। তাই আমাদের সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল করে তুলতে হলে, আসুন আমরা যুক্তির আশ্রয় নেই। ঝেড়ে ফেলি সকল অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর পবিত্র বিশ্বাসের নামে অপবিশ্বাসগুলো। এর কোনো বিকল্প নেই।

মুক্তচিন্তক পরিচিতি*

ড্যান বার্কার

অনুবাদ : মিহিরকান্তি চৌধুরী

মুক্তচিন্তকরা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে, ঐতিহ্য, কর্তৃত্ব ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস নিরপেক্ষ হয়ে যৌক্তিক মানদণ্ডে নিজের বিশ্বাসের কাঠামো নির্মাণ করেন। তাঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন নাস্তিক, তেমনই রয়েছেন অজ্ঞাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী ও নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদীরা।

ধর্মবিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থ ও ত্রাণকর্তার প্রতি আনুগত্য রেখে মুক্তচিন্তক হওয়া সম্ভবপর নয়। মুক্তচিন্তকদের কাছে রহস্যোদঘাটন নিরর্থক এবং গোঁড়ামি সত্যের পথে বাধাস্বরূপ।

মুক্তচিন্তকের জ্ঞানের ভিত্তি কী?

মুক্তচিন্তকরা প্রকৃতিবাদীও বটে। বাস্তবতার সাথে শুধু সত্যেরই সামঞ্জস্য রয়েছে। বাস্তবতা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবনযোগ্য অথবা যুক্তিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নিশ্চিত হওয়া বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানমনস্কতা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। কোনো একটি বিষয়কে সত্য বলে মানতে হলে সেটাকে অবশ্যই যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে (একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার উপযুক্ততা), হতে হবে পরিবর্তনযোগ্য (তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত না হওয়ার জন্য বিবেচ্য), হিসেবী (সীমিত অনুমানভিত্তিক সহজ ব্যাখ্যার উপযুক্ততা) এবং যুক্তিসম্মত (বিরোধমুক্ত)।

মুক্তচিন্তক ব্যক্তিরা মানবজীবনকে নৈতিকতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। যা মানবকল্যাণ নিশ্চিত করে তাই 'অকল্যাণকর' এবং যা তাকে বিপদাপন্ন করে তাই 'অমঙ্গল'। সৃষ্টি পরম নয়। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে জীবন। কাজেই যুক্তিবাদীরা মানবতাবাদীও বটে। এটা থেকেই আমাদের এ বিশ্বের কল্যাণের জন্য আগ্রহের সৃষ্টি আর সেটা জীবজন্তু পর্যন্তও ব্যাপ্ত।

*লেখকের অনুমতিক্রমে `Losing faith in faith; from preacher to atheist' গ্রন্থের "What is a freethinker" পরিচ্ছেদের অনুবাদ।

একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত বা বিচার-বিশ্লেষণ 'ন্যায়-অন্যায়'কেন্দ্রিক। অধিকাংশ নৈতিক প্রশ্নে মূল্যবোধের বিরোধ রয়েছে যেখানে যুক্তির সতর্ক প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। অন্যের মানসিক কাঠামোকে শাসন করা চরমভাবে অনৈতিক ও খুবই বিপজ্জনক।

মুক্তচিন্তকরা কি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান?

মুক্তচিন্তকরা অবশ্যই জানেন যে অভিপ্রায়ের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন। মহাবিশ্বের মন নেই, ভাবনাও নেই বলেই আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে যদি আপনি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চান। ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি মানবিক নৈতিকতাকে বজায় রেখে নিজস্ব কাঠামো নির্মাণ করতে পারেন।

অনেক মুক্তচিন্তক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি অনুভূতি ও সহানুভূতি প্রদর্শনে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এ ধরনের ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে মানুষের অপ্রয়োজনীয় দুঃখ-কষ্ট, সামাজিক উন্নয়ন, মানবাতাবোধের সৌন্দর্য (শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য), ব্যক্তিগত সুখ সাচ্ছন্দ্য, আনন্দ, ভালোবাসা ও জ্ঞানের উন্নয়ন।

জীবনের জটিলতা কি সৃষ্ট নয়?

জীবনে যে কোনো প্রশ্ন বা জটিলতা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব লক্ষ-কোটি বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সৃষ্টিকাঠামোর ব্যাখ্যা দান করেছে। দৈবভাবে কোনো কিছুর সৃষ্টির প্রসঙ্গ আসে না কারণ সেক্ষেত্রে সার্বিক

বিষয়টিও সমভাবে যুক্তিকতার মানদণ্ডে উন্নীত হতে হবে। মুক্তচিন্তকরা স্বীকার করেন যে, এ মহাবিশ্বে রয়েছে অনেক বিশৃঙ্খলা, অস্বস্তি এবং কষ্ট-বেদনা–যেগুলোর ব্যুৎপত্তির ব্যাখ্যার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

মুক্তচিন্তকদের কেন ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান?

মুক্তচিন্তকরা দৃঢ়প্রত্যয়ী যে-ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে সত্যতার অভাব রয়েছে যেগুলো সাক্ষ্য প্রমাণও যুক্তির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মিথ্যাকে বিশ্বাস করে কিছু অর্জনের যে কিছু নেই, শুধু তাই নয় কুসংস্কারের কাছে আমাদের যুক্তির অপরিহার্য মানদণ্ডটি হারানোর ফলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই হবার উপক্রম হয়।

অধিকাংশ মুক্তচিন্তক ধর্মকে শুধু মিথ্যাশ্রয়ী বলেন না, ক্ষতিকর বলেও মনে করেন। ধর্মযুক্তবিগ্রহ, দাসত্ব, নারী-পুরুষ বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য, হানাহানি, অসহনশীলতা ও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে ন্যায্যতা দান করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ধর্ম কি বিশ্বের কোনো অসাধারণ মঙ্গল বয়ে আনেনি?

কিছু কিছু ধর্মবাদী ভালো লোক কিন্তু তাঁরা তো যে কোনো মানদণ্ডেই ভালো। মুক্তচিন্তকদের ন্যায় বিচার বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ধর্মবাদীদের ক্ষেত্রে ধর্মের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই।

বস্তুত অধিকাংশ আধুনিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারাই হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছেন ক্লারা-বার্টন, আলবার্ট আইনস্টাইন, এন্ড্রু কার্নেগী, থমাস এডিসন, মেরী কুরী, এলিজাবেথ ক্যাডী স্টান্টন, সুসান বি প্রন্থনী, এইচ এল মেনকেন, চার্লস ডারউইন, সিগমাণ্ড ফ্রয়েড, বরার্ট বার্নস, পার্সি শেলী, জোহানস ব্রামস এবং আরো অনেকে যাঁদের আমরা আজও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য সম্মান করি।

অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাস প্রতিনিয়তই প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে আসে দাসত্বপ্রথা বিলোপের প্রশ্ন। নারী সমাজের ভোটাধিকার, মহিলাদের গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নে অবেদনিক ব্যবহার, সৌরজগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিবর্তন, বিদ্যুৎ দণ্ডের ব্যবহার এবং রাষ্ট্র ও গীর্জার প্রশ্নে আমেরিকার নীতি ইত্যাদি।

মুক্তচিন্তকদের কি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে?

না, মুক্তচিন্তা মনস্তাত্ত্বিক একটি বিষয়, রাজনৈতিক নয়। আজকাল মুক্তচিন্তা বাস্তবে প্রায় সকল রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগতদের মধ্যে প্রসারতা লাভ করেছে। আর সেটা পুঁজিপতি, ব্যক্তিবাদী, সমাজবাদী, সাম্যবাদী, রিপাবলিকান, ডেমোক্রেট, উদারপন্থী, রক্ষণশীল যেই হোন না কেন। সাম্যবাদ ও নাস্তিকতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এডাম স্মিথ ও আইন রেন্ড-এর মতো ব্যক্তিত্বরা ছিলেন গোঁড়া পুঁজিপতি। অন্যদিকে অনেক সাম্যবাদীও ছিলেন গোঁড়া ধার্মিক যেমনটির উদাহরণ হিসেবে আদি খ্রিস্টীয় গীর্জার (Early Christian Church) কথা উল্লেখ করা যায়।

নাস্তিকতা/মানবতাবাদ কি ধর্মের পর্যায়ে পড়ে?

নাস্তিকতা কোনো বিশ্বাস নয়। এটা দেব-দেবীতে বিশ্বাসের অভাব। কোনো বিশ্বাসের সংকটে নতুন কোনো বিশ্বাসের প্রয়োজন পড়ে না। নাস্তিকতা বাস্তব পক্ষে যুক্তিবাদের প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটা কোনোভাবেই ধর্মের পর্যায়ে পড়ে না।

মুক্তচিন্তকরা 'ধর্ম' কথাটিকে কিছু বিশ্বাসকাঠামোর মধ্যে বিচার করেন যেখানে রয়েছে অলৌকিক জগতের কথা, বিগ্রহের কথা, দৈবভাবেপ্রাপ্ত লিখিত ধর্মবাণীর কথা যা সংশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবোধের কোনো ঈশ্বর, কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো ত্রাণকর্তা নেই। এটা স্বাভাবিক যে যুক্তিবাদী দর্শন নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা নমনীয় ও বাস্তবসম্মত–এটা ধর্মের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

ধ্যান-ধারণার বহুত্ব কি মানবতার অগ্রযাত্রা নয়?

হ্যাঁ, এটাই আমাদের প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন। গোঁড়ামির শৃঙ্খলমুক্ত ব্যক্তিচিন্তার বহুতা যে কোনো ধ্যানধারণাকে বিচার বিশ্লেষণের গ্রহণের বা বর্জনের উপযোগী করে তোলে। ধর্মীয় গোঁড়াদের সর্বগ্রাসী মনোভাব প্রগতিকে ব্যাহত করে।

মুক্তচিন্তক হিসেবে কেন আমি গর্ববোধ করি?

মুক্তচিন্তা বা যুক্তিবাদ বাস্তবতা সম্মত। মুক্তচিন্তা কাউকে তার নিজের মতোই চিন্তা করতে সাহায্য করে। মুক্তচিন্তকরা প্রাচীন কুসংস্কারের অন্ধভক্ত হওয়াতে কোনো অহংকার দেখেন না, অহংকার দেখেন না আদিকালের উন্মোচিত কোনো দৈবশাসকের সম্মুখে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবনত হতে। মুক্তচিন্তা সম্মানজনক। মুক্তচিন্তা প্রকৃতপক্ষে বন্ধনহীন।

যুক্তি ও যুক্তিবাদ

অনন্ত বিজয় দাশ

যখন থেকে মানুষের যাত্রা শুরু, সেই পঞ্চাশ-ষাটহাজার বছর আগের নিয়্যানডারথ্যাল প্রজাতি থেকে বর্তমানকালের ক্রো-ম্যাগনন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে ভাবনাটি মানবমস্তিষ্কে উদিত হয়েছে, তা হলো 'কেন'। এটা কী, ওটা কী, এটা কেন, ওটা কেন। এই 'কেন' ভাবনাটি মানুষকে চালিত করেছে, মানুষের চিন্তায় পৃথিবীর নানা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগিয়েছে, মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণে চালিত করেছে। মানুষ আজ যতটুকুই 'মানুষ' হোক না কেন, তার সবটুকুরই পেছনে একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে অহর্নিশ জেগে থাকা 'কেন' প্রশ্নটি। প্রাচীনকালের গুহাবাসী মানুষ লক্ষ্য করেছে, আকাশে কী সুন্দর করে ডানা মেলে উড়ে যায় পাখি, গাছ থেকে টপটপ করে ফল পড়ে, শুকনোপাতা ঝরে পড়ে, নদীতে নির্দিষ্ট সময় পরপর জোয়ার-ভাটার খেলা হয়, প্রতিদিন ভোর হলে একই নিয়মে আকাশে সূর্য দেখা যায়, সূর্যের আলোয় ভরে যায় পৃথিবী; আবার সন্ধ্যা হলে সূর্যকে দেখা যায় না, আস্তে আস্তে গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে যায়। এই সময়ে একচিলতে আলো নিয়ে উপস্থিত হয় চাঁদ। পৃথিবীর এই সকল নানা ঘটনার পাশাপাশি সূর্য-চন্দ্রের এই লুকোচুরি খেলা মানবমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে, ভাবিত করেছে, জিজ্ঞাসা জাগিয়েছে। এই জিজ্ঞাসার আর কৌতুহলের উত্তর জানার তাগিদেই মানুষ সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান'কে, যা মানুষকে সভ্যতা গড়ার পথে পরিচালিত করেছে। অর্থাৎ এই প্রশ্ন করার বাতিক আর উত্তর খোঁজার তাগিদই মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, সবচেয়ে বড় সম্পদ; পৃথিবীকে বদলে ফেলার, নতুন পৃথিবীকে গড়ার। কোন ধরনের গায়েবি মাজেজায় কিংবা আপ্তবাক্যে কখনও নিঃসংশয় না থেকে মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে তার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার 'প্রশ্ন করার বাতিক আর উত্তর খোঁজার তাগিদ।' এরই ফলে সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষের চিন্তায় তৈরি হয়েছে সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি, জিজ্ঞাসায় ভরপুর 'প্রশ্ন করা এবং উত্তর খোঁজার' এক প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এই জ্ঞান-অন্বেষণের তীব্র স্পৃহা থেকেই তৈরি হয়েছে *যুক্তি*, যা বাস্তব জীবনে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠি। যুক্তি মানুষের মস্তিস্কক্রিয়ার ফল বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাপ্রসূত। আরো ভালোভাবে বললে বলা যায়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার সুসংবদ্ধরূপই হচ্ছে যুক্তি। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি-যুক্তি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। ফলে মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি মানুষকে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সাহায্য করে। অপরদিকে অবস্তুতান্ত্রিক যুক্তিহীন ভক্তি-ভয়-বিশ্বাস মানুষকে কার্যকারণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবতার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধাগ্রস্থ করে। মুক্তচিন্তা, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনষ্কতার বদলে অপ্রমাণিত অলৌকিক বিশ্বাসনির্ভরতা, কল্পিত-অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণে মানুষের অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা, মেধা-মনীষার অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু তারপরও অজ্ঞতার, অন্ধকার যুগের কিংবদন্তি ও পৌরাণিক বিশ্বাস আজো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগেও আমাদের মাঝে হাত ধরাধরি করে সহাবস্থান করেছে, এবং পশ্চাৎদিকে অনবরত টেনে ধরছে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। শৈশবের পৌরাণিক অতিকথা, উপাসনা-ধর্মীয় উপাখ্যান, পাপ-পূণ্যের শাস্তি, পুরস্কারের লোভ কখনোই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি। বরঞ্চ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনষ্কতা, কর্মস্পৃহা, মনুষ্যত্ব মানবসভ্যতাকে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এখনো যাচ্ছে।

'*যুক্তিবাদ*' নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমেই বলে ফেলা ভালো 'যুক্তিবাদ' হচ্ছে 'যুক্তিকেন্দ্রিক মতবাদ'; একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দর্শনশাস্ত্র মোটা দাগে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে 'ভাববাদ' এবং অপরটি হচ্ছে 'বস্তুবাদ'। এই 'ভাববাদ' এবং 'বস্তুবাদ' নিজেরা বিভিন্ন তত্ত্বে বহু 'বাদ'–'মতবাদ'–এ বিভক্ত। যাই হোক, এই বস্তুবাদের মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তিবাদ বা 'Rationalism'।

এখন 'বাদ' বা 'Ism' ব্যাপারটা ঠিক কী, সেটাই প্রথমে দেখা যাক। 'বাদ' বা 'Ism' সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বললে বলা যায় 'বাদ' বা 'Ism' সাধারণত তিন ধরনের। প্রথমত জীবন ও জগৎ ঠিক কী রকম, সে প্রসঙ্গে কোনও দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক মতকে 'বাদ' বা 'Ism' বলে। যথা-বার্কলের Solipsism, ডেভিড হিউমের Agnosticism। দ্বিতীয়ত কোনও দার্শনিক মতের ধরন বা দৃষ্টিভঙ্গিকে 'বাদ' বা 'Ism' বলা হয়। যথা– Idealism, Realism ইত্যাদি। আবার তৃতীয়ত দার্শনিক আলোচনার পদ্ধতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জ্ঞানতত্ত্বগত উপায় বা সোপানকেও বাদ বা 'Ism' বলা হয়ে থাকে। যথা Criticism, Scepticism ইত্যাদি। এছাড়া আরো অসংখ্য অর্থে 'বাদ' বা 'Ism' শব্দটি ব্যবহৃত

হয়। কিন্তু সেগুলো এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

'বাদ' বা 'Ism' সম্পর্কে তৃতীয়ত যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তার আলোকে দেখা যায় যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সোপানকেও 'বাদ' বা 'Ism' বলা হয় এবং যুক্তি যেহেতু কোন বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে বা দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সোপান, অতএব 'যুক্তিবাদ' অবশ্যই একটি 'বাদ' বা 'Ism'। এছাড়াও প্রথমত এবং দ্বিতীয়ত বলে যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে; এর আলোকে দেখা যায় যে, 'যুক্তিবাদ' একটি 'দর্শন', 'মতবাদ' বা 'Ism'। অর্থাৎ 'যুক্তিবাদ' শুধু বিচার-বিশ্লেষণের কিছু পদ্ধতিগত কায়দাকানুন নয়, 'যুক্তিবাদ' একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন, একটি বিশ্বনিরীক্ষণ-পদ্ধতি, একটি বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি :

Logic বা যুক্তিবিদ্যায় সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুটি পদ্ধতি আছে।

যথা- ১. ডিডাকশন (Deduction) বা অবরোহ; ২. ইন্ডাকশন (Induction) বা আরোহ।

এ সর্ম্পকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যায় যে :

১. অবরোহ বা ডিডাকশন (Deduction) হলো, কোনো ব্যাপক বা সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে পৌঁছনোর কায়দা। ধরা যাক, বলা হলো 'সব মানুষই মরণশীল' এবং আরো বলা হলো 'রহিম সাহেব একজন মানুষ,' তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, 'রহিম সাহেব মরণশীল।

... এই পদ্ধতিটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রহিম সাহেব একই সঙ্গে অমর ও মরণশীল হতে পারেন না। যেকোনো একটিই তাকে হতেই হবে। কিন্তু তিনি অমর হলে প্রথম বাক্য 'সব মানুষই মরণশীল'–এর বিরোধিতা করা হয়। অর্থাৎ, তাহলে রহিম সাহেব মানুষ নন। কিন্তু রহিম সাহেব 'মানুষ' হলে তাকে অবশ্যই মরণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখন দেখা যাচ্ছে যে, 'সব মানুষ মরণশীল'–এই সাধারণ সত্য থেকে আমরা একজন বিশেষ মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। অর্থাৎ বহুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত থেকে একের বিষয়ে নেমে এসেছি। এটাই অবরোহমূলক যুক্তি এবং এই অবরোহমূলক যুক্তির পেছনে আছে আত্মবিরোধিতা বা স্ববিরোধিতা না করার নীতি, যাকে ইংরেজিতে বলে 'Law of non self-contradiction' এবং তার সাথে আছে 'জগৎ সংসার স্ববিরোধী নয়'–এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি।

২. আরোহ বা ইন্ডাকশন (Induction) হলো– কোনো বিশেষ ঘটনা বা সত্য থেকে পাওয়া তথ্য থেকে একটি ব্যাপক বা সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। ধরা যাক, বলা হলো :

'করিম সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'জলিল সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'সালাম সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

'মতিন সাহেব' পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়েছেন এবং মরেছেন।

... এমনি করে অসংখ্য পটাশিয়াম সায়ানাইড-খাওয়া ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল, পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার কারণে মারা গেছেন। ফলে অসংখ্য ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালানোর ভিত্তিতে বলা যায়, 'যে পটাশিয়াম সায়ানাইড খায়, সে মারা যায়।' মূলত এখন যত বেশি সংখ্যক লোকের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, ততই সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হবে অথবা নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

আরোহমূলক যুক্তির পিছনে কয়েকটি মৌলিক নীতি বা Principle রয়েছে।

যেমন :

১. 'প্রত্যেকটি ঘটনারই কারণ রয়েছে, যাকে ইংরেজিতে বলে 'Law of Causation'– এই প্রত্যয় না থাকলে 'মৃত্যু'র আদৌ কোনো কারণ আছে কি না তা নিয়ে সংশয়ে পড়তে হয় এবং পরবর্তী ঘটনার কারণ খোঁজার প্রশ্নই আসে না।

২. 'একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে বা 'Law of Uniformity of nature'–এই প্রত্যয় না থাকলে অসংখ্য লোক পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরলেও সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যেত না।

৩. 'অনুসন্ধান বা গবেষণা করলে প্রতিটি ঘটনারই কারণ সম্পূর্ণ বোধগম্য হতে বাধ্য।'–এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস করলেও কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-এর ক্ষেত্রে একপাও এগোনো যাবে না। যদি ভাবা হয় মৃত্যুর কারণ থাকলেও তা জ্ঞান বা বুদ্ধির অগম্য, তাহলে পটাশিয়াম সায়ানাইড বা ঐ জাতীয় কোনো বাস্তব বিষয়ের মধ্যে কারণ খোঁজে বেড়ানোর কথা মাথাতেই আসা উচিৎ নয়।

... উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবরোহ বা আরোহ যে ধরনেরই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, কতগুলো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। যেমন : স্ববিরোধিতা করা চলবে না, প্রতিটি ঘটনারই

কারণ খুঁজতে হবে, কারণগুলো সর্বজনীন হবে এবং কারণগুলো বোঝা যাবে।

এখন যে প্রশ্নগুলো উঠে আসে, কার স্ববিরোধিতা না করা, কিসের ঘটনা, কিসের কারণ, কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে, কিসের বোধগম্যতা? ইত্যাদি।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে, যখন এক পরিবর্তনশীল বস্তুতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগুলো চিন্তা করি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করি এবং যেকোনো সফল স্বার্থক ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ চিরকালই তাই করে আসছে। 'যুক্তিবাদ' তাই আসলে 'বস্তুবাদ। বস্তুময়তা এবং বাস্তব পরিবর্তনশীলতার ধারণা ছাড়া যুক্তি, লজিক একেবারেই দাঁড়ায় না। তাই বস্তুপরিবর্তন-যুক্তি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে বাধা। একমাত্র বিমূর্ত চিন্তা ছাড়া যুক্তির অস্তিত্ব আমরা অন্য কোথাও অবহেলা করতে পারি না।

যুক্তিবাদ তাই আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি, আমাদের আত্মমগ্নতা ও বহির্মুখিতা উভয়েরই সঙ্গী। যুক্তিবাদ মানে একটি গোটা বিশ্ববীক্ষা অর্থাৎ গোটা বিশ্বনিরীক্ষণ পদ্ধতি, স্ববিরোধিতাহীন জীবনদর্শন।

তথ্যসূত্র :

১. মফিজুর রহমান রুননু, যুক্তিবাদ চেতনামুক্তির লড়াই, পড়ুয়া প্রকাশনী, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ।

২. প্রবীর ঘোষ, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।

এ সংখ্যার লেখক-পরিচিত

১. ড. অজয় রায় : বিজ্ঞানী, অধ্যাপক (অব.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২. অভিজিৎ রায় : গবেষক, প্রকৌশলী। মুক্তমনা (mukto-mona.com) আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখ্যযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫) ইত্যাদি।

৩. বন্যা আহমদঃ আমেরিকা প্রবাসী সিস্টেম এনালিস্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'বিবর্তনের পথ ধরে' (অবসর প্রকাশনী, ২০০৭)।

৪. আকাশ মালিক : ইংল্যান্ড প্রবাসী কবি, লেখক।

৫. নন্দিনী হোসেন : ইংল্যান্ড প্রবাসী লেখক। সাতরং (satrong.org) আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা।

৬. ফরিদ আহমেদ : মুক্তমনা আন্তর্জালের কো-মডারেটর। যৌথভাবে প্রকাশিত গ্রন্থ : 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (অবসর প্রকাশনী, ২০০৭)।

৭. মৌ মধুবন্তী : কানাডা প্রবাসী কবি। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'রক্তনদী একা'।

৮. জাহেদ আহমদ : আমেরিকা প্রবাসী, বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স। মুক্তমনা আন্তর্জালের কো-মডারেটর।

৯. মফিজুর রহমান রুন্নু : যশোর যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'যুক্তিবাদ চেতনামুক্তির লড়াই' (পড়ুয়া প্রকাশনী)।

১০. অরুনকান্তি দাশ : লেখক, ব্যাংক এমপ্লয়ি।

১১. মাহমুদ আলী : কবি, প্রকাশিত উপন্যাস : 'নরকে শূন্য থালা'।

১২. অ.আ.ম. রেজা : কবি, প্রাবন্ধিক।

১৩. জাহিদ রাসেল : ইংল্যান্ড প্রবাসী লেখক।

১৪. সুমন তুরহান : অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : 'এই পাখির প্রবাহ এই ঋতুবতী মেঘ (২০০০), ঝরাসময়ের গান (২০০৫) ইত্যাদি।

১৫. ফাতেমা রেজমিন : লেখক। শিক্ষার্থী; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

১৬. মনির হোসাইন : লেখক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষার্থী ; মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট।

১৭. এম.এ. আলিম : কবি, লেখক। শিক্ষার্থী; মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট।

১৮. লিটন দাসঃ প্রাবন্ধিক। শিক্ষার্থী; মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট।

১৯. সৈকত চৌধুরী : লেখক। শিক্ষার্থী ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২০. মিহিরকান্তি চৌধুরী : লেখক, অনুবাদক। পরিচালক, একাডেমী অব টু আরস, সিলেট। প্রকাশিত কাব্য : 'ওরিয়েন্টাল সান' (২০০০)।

২১. অনন্ত বিজয় দাশ : শিক্ষার্থী ; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

নবজীবনের সন্ধানে

একদল পরিবর্তন প্রয়াসী মানুষ; একটি বিপ্লব। অসংখ্য তাজা প্রাণ; অনেক রক্ত। একটি নতুন ভোর; অসংখ্য নবজীবন। মাঝখানে কেটে যাওয়া দুরন্ত সময়।

আবার একদল পরিবর্তন প্রয়াসী মানুষ; একটি বিপ্লব। অসংখ্য তাজা প্রাণ; অনেক রক্ত। একটি নতুন ভোরের প্রতীক্ষায় অনেক প্রাণ; বাঁচার আকুতিতে।

এ বিপ্লবের নাম 'সন্ধানী'; রূপকার অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ আর মূলমন্ত্র 'স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলন।'

বাংলাদেশে স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলন সর্বপ্রথম শুরু করে 'সন্ধানী'। ১৯৭৮ সালের ২রা নভেম্বর একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে দিনটিকে 'জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এরপর এগিয়ে চলা, অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে; অনেক ত্যাগ, তবু আমরা দেখা পাইনি সেই ভোরের, যেখানে রক্তের অভাবে মারা যাবেনা আর একজন মানুষও।

কারণ এখনো এদেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় রক্তদান হতে দূরে; এখনো রক্তের প্রয়োজনে পেশাদার রক্তদাতাদের সাথে তাদের অসহায় সখ্যতা। আর এর মূলে রয়েছে সচেতনতার অভাব, অনর্থক আজও অজ্ঞতাজনিত ভয়। এজন্য সন্ধানীর রয়েছে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী; সাক্ষাতে এবং অন্যান্য মাধ্যমে। প্রতিবছর এদেশে প্রায় আড়াই-তিন লক্ষ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন হয়; এর মধ্যে মাত্র প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করে সন্ধানী। কিছু সংগৃহীত হয় রেডক্রিসেন্ট, বাঁধন ও অন্যান্য সংগঠনের মাধ্যমে আর স্বেচ্ছাদাতাদের মাধ্যমে। আর বাকি চাহিদার প্রায় অনেকটুকু আসে পেশাদার রক্ত বিক্রেতার কাছ থেকে; আর কিছুটা আসে না। এসব পেশাদার রক্তবিক্রেতারা মাদকাসক্ত; যারা হেপাটাইটিস-বি.সি, সিফিলিস, এইডসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এদের রক্ত গ্রহণের মাধ্যমে রোগী আক্রান্ত হয় এসব প্রাণঘাতী রোগে। ফলশ্রুতিতে হারিয়ে যায় অসংখ্য তাজা প্রাণ নীরবে।

অথচ আমাদের এতটুকু ইচ্ছা আর সচেতনতা পারে এসব মৃত্যুপথযাত্রীকে ফিরিয়ে আনতে; যারা আমাদেরই ভাই-বোন-বন্ধু। ৪৭.৫ কেজি ওজন সম্পন্ন ১৮ থেকে ৫৭ বছর বয়সী যে কোন সুস্থ মানুষ প্রতি চারমাস অন্তর রক্তদান করতে পারেন। আমাদের শরীরের রক্তকণিকাগুলো প্রতি চারমাস পর আপনিই নষ্ট হয়ে যায়। অথচ আমরা যদি এক ব্যাগ রক্তদান করি এবং একজন অসুস্থ মানুষের শরীরে দেয়া হয়, তাহলে তা পারে তাকে বাঁচাতে। রক্তদানে শরীরের কোন ক্ষতি হয়না। জলীয় অংশ সেদিনই পূর্ণ হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য মনোবল ব্যতীত আর কিছুই প্রয়োজন নেই। আর সন্ধানীতে রক্তদান করলে আপনি পাচ্ছেন একটি ডোনার কার্ড; যার মাধ্যমে আপনার বা আপনার আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজনে বাংলাদেশের যেকোন সন্ধানী ইউনিট হতে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবেন। সর্বোপরি মানবসেবার যে আনন্দ, তা থেকে আপনি কেন নিজেকে বঞ্চিত করবেন? তাই–আসুন প্রতিজ্ঞা করি স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে।

স্বেচ্ছায় রক্তদানের পাশাপাশি মরণোত্তর চক্ষুদান নিয়েও কাজ করছে সন্ধানী। এদেশে প্রায় ১৫লক্ষ লোক কর্ণিয়াজনিত অন্ধত্বের স্বীকার। যার একমাত্র সমাধান কর্ণিয়া প্রতিস্থাপন। আর তার জন্য প্রয়োজন ভালো কর্ণিয়া, যা একমাত্র মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে সম্ভব। আপনার একটু সদিচ্ছায় একজন হয়তো দেখতে পাবে পৃথিবীর আলো; গড়ে ওঠতে পারে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে। মরণোত্তর চক্ষুদানের ব্যাপারে ধর্মীয় কোন বিধি নিষেধও নেই। তাই মরণোত্তর চক্ষুদানের মাধ্যমে আসুন আমরা আলোকিত করি অনেক আলোহীন সম্ভাবনাময় জীবন।

আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞা করি; সহযাত্রী হই সেই মহান বিপ্লবের যা মানুষকে দেখায় বাঁচার স্বপ্ন, করে তোলে আলোকিত আঁধারবাসীকে।

যোগাযোগ

সন্ধানী

(মেডিকেল ও ডেন্টাল ছাত্র-ছাত্রী পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান)
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ইউনিট
সিলেট, বাংলাদেশ।
ফোন : ৭১০৮৮০।

(সমাপ্ত)